দেশ-বিদেশের অলৌকিক কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :

অজিত কুমার সামুই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পিতামহ

৺দিগিন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবং

পিতামহী ৺সরোজিনী দেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

বিষয় সূচী

লেক-এর দেবী নৈনী

—প্রতিটি সপ্তম বলী যে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হওয়া চাই। সরোবরের দেবীর আদেশ।

জে. এইচ. লিসবী নামক ইংরেজ ভদ্রলোক যখন এই কিংবদন্তীর কথাটি স্থানীয় একজন গাইড মারফৎ শুনলেন, বিশ্বাসই হল না তার। বলে কি! হিমালয়ের ওপর নৈনীতালের এই সুন্দর লেক্‌টি প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে এতই মনোরম যে পূর্বোক্ত ভয়ংকর রোমহর্ষক কাহিনীটি যেন এখানে মানায় না। কোন মতেই খাপ খায় না।

কিডনী আকারের এই লেকটি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ছয় হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এরই তীর বরাবর ছোট একটি গ্রাম।

লেকের চারদিকেই পাহাড়। একদিকে চীনা পিক, তার তুষার শুভ্র শীর্ষ সর্বদাই লেকের জলে প্রতিফলিত। হিমালয়ের সৌন্দর্য যেন এখানে জলে স্থলে উভয় স্থানেই প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত।

স্থানীয় মোটর বাস উপরে চড়াই পথে ওঠবার ধকল সহ্য না করতে পেরে অধিকাংশ সময়েই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে থেমে পড়ে এই লেকের কাছে।

একমাত্র গভর্নরের গাড়ি ছাড়া এই তীরভূমি পার হয়ে রৌদ্র-করোজ্জ্বল গ্রামটির অপার্থিব শান্তি বিঘ্নিত করবার অধিকার অন্য কোন মোটর যানের নেই।

শুধু মাত্র রিকশা কিংবা ঘোড়ায় চড়ে পর্যটকগণ যেতে পারে যতদূর খুশী এগিয়ে।

সমতল ভূমির (ভারতবর্ষের) বিরক্তিকর উত্তাপের পর, গা জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস, আর তুষার শুভ্র পর্বতে ঘেরা নয়ন

মনোহর দৃশ্যাবলী দেহ ও মনের পক্ষে পরম লোভনীয়, উপকারী। তাই দলে দলে স্বদেশী-বিদেশী পর্যটকদের মিছিল লেগেই আছে গ্রীষ্মকালে।

এখানে সূর্যের আলোর অভাব নেই। সোনালী রোদে চতুর্দিক উদ্ভাসিত।

তবে এখন বুঝি 'সীজন' শেষ হয়ে এল।

অনতিবিলম্বে পর্যটকগণ, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভ্রমণ বিলাসীবৃন্দ সমতল ভূমির শীতঋতুতে ফিরে যাবে।

লিসবী সাহেব নৈনীতালে থাকতে থাকতেই এক প্রত্যুষে তাঁর নজর পড়লো চীনা পীকের মাথা ছাড়িয়ে অনেক নিচে পর্যন্ত তুষার ছড়িয়ে পড়েছে। কঠোর শীতকাল প্রায় এসে গেছে।

তবে তখনো বোগেন ভিলেইয়া ফুল তার তাজা রক্তবর্ণ পাপড়ি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। ফুল বিক্রেতাদের ঝুড়িতে তখনও অজস্র বর্ণের ফুলের সমারোহ শেষ হয়ে যায় নি।

লেক-এর চারদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বিচিত্র রঙের পোষাক পরে লেকের তীর বরাবর পথ ধরে দলে দলে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

নৈনীতাল জীবনের মধ্যমণি স্বরূপ এই লেক।

এই দিকে পোলো গ্রাউণ্ড। অপর দিকে, ঘাটে নানা রঙচঙা নেটিভ—নৌকো সমূহ। সেগুলো ভাড়া করে পর্যটকগণ যখন তখন জল বিহার করে থাকে।

লিসবী সাহেবও এই নৌকো চড়ে প্রত্যহ পান ভোজন সহ কয়েক ঘণ্টা জলে সাঁতরে কাটিয়েছে। মিঠে রোদ আর নয়ন মুগ্ধকারী প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুভূতি হয় যেন স্বর্গসম।

লেকের তীরে পথের ধারে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বাঁকানো বাঁশের পোস্টে দেখা যায় অনেকগুলো প্রার্থনা ঘণ্টা অর্থাৎ ঘণ্টা ঝুলতে।

অনবরতই স্থানীয় অধিবাসীরা যাবার পথে সেখানে বারেক থেমে যে কোন একটি ঘণ্টা বাজিয়ে ফের নিজ গন্তব্য পথে চলে যায়। ঘণ্টা বাজিয়ে অবশ্যই তাদের মনোবাঞ্ছা পুরনের প্রার্থনা জানিয়ে যায়।

এরই লাগোয়া গাছপালার আড়ালে রয়েছে একটি ছোট মন্দির, নৈনী দেবীর মন্দির।

এ দেবী ও তাঁর মাহাত্ম সম্বন্ধে গাউডকে প্রশ্ন করায় লিসবী শুনতে পেল ঐ ভয়াবহ কিংবদন্তীটি—"প্রতিটি সপ্তম বলী যে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হওয়া চাই। সরোবরের দেবীর দাবী বা আদেশ এইই।"

এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল (এবং বাস্তবেও তাই ঘটে আসছে) যে প্রতি বছর লেকের জলে ডুবে মৃত্যুস্বরূপ এক একটি মানুষ দেবীর বলী হিসেবে গৃহীত হয়। দেবী বাৎসরীক এক একটি প্রাণ গ্রহণ করে থাকেন। এটাই হল দেবীর দাবী।

সাধারণ ভাবে প্রতি বছর এক একজন নেটিভ-এর প্রাণ গ্রহণ করেই দেবী তৃপ্ত থাকেন। কিন্তু প্রতি সপ্তম বছরে তার চাই একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রাণ।

ফলে দেখা যায় লেক-এ প্রচুর নৌকাডুবি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা একের এর এক ঘটে যাচ্ছে। যদিও এ লেক দৃশ্যত খুবই শান্ত নিস্তরঙ্গ এবং নিরাপদ।

অন্তত লিসবি সাহেবের তাই মনে হয়েছে দেখে শুনে। এমন ঠাণ্ডা নম্র লেক-এ নৌ-দুর্ঘটনা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছে তাঁর।

অবশ্য এটা ঠিক লেক-এর স্থানে স্থানে ঝাঁঝি বা দাম নামক জলজ উদ্ভিদ এত ঘন সংবদ্ধভাবে আছে যে মাঝে মাঝে তার নাগপাশ থেকে নৌকোকে মুক্ত করা খুবই কষ্টকর।

এই লেকটির অবস্থিতি এমনই যে এর গোটাটা চতুর্দিকের তীর-ভূমির যে কোন স্থান থেকে দেখা যায়। আর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের নজরের মধ্যেই থাকে এই গোটা লেক।

লিসবি সাহেবের কাছে গাইড যে কিংবদন্তীর কাহিনী বিবৃত করে গেল তার মধ্যে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে বৃক্ষরাজি ঘেরা মন্দিরের পুরোহিত নাকি দেবীর বলি হিসেবে অনিবার্য একটি নৌ-দুর্ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। এর অন্যথা হওয়া চলবে না। এ নাকি দেবীর আদেশ। হতেই হবে। বলী চাইই বাৎসরিক অর্ঘ্য হিসেবে।

তাই, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, একটি নৌকোডুবি হওয়া চাই বা প্রয়োজন হলে হওয়ানো চাই।

লিসবি সাহেব স্বভাবতই এ ধরণের নেটিভ কিংবদন্তীতে কর্ণপাতও তেমন করে নি, গুরুত্ব তো আদৌ দেয়ই নি। কারণ তার কাছে এসব পৌত্তলিকতা স্রেফ কুসংস্কার মাত্র। সে আধুনিক মানুষ।

ভারতবর্ষে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত জনপদে শ্বেতাঙ্গ মানুষ-জন তেমন অনুপ্রবেশ করেনি যতটা এ দেশের নগর বন্দর তাদের দ্বারা অধ্যুষিত।

লিসবি সাহেব যদি আগে ভাগে জানতে পারতো যে সে যখন নৈনতালে যত্র-তত্র ও লেকে জলবিহার ও ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে সেটা হল দেবীর দাবী অনুযায়ী সপ্তম বছর, তাহলে হয়ত মনের আনন্দে নৌকো চড়ে গুণ-গুণ গান ও বোতল পান সহ ঐ ভয়াবহ লেক-এ ঘুরে বেড়াতে পারত না। অর্থাৎ সাহস হত না।

এটা সপ্তম বছর এবং এ বছরই দেবীর জন্য বলী প্রয়োজন জনৈক শ্বেতাঙ্গ মানুষের। সর্বনাশ।

যাইহোক লিসবি সাহেব প্রাণ নিয়ে এক সময় পাহাড় থেকে নেমে তার তদানিন্তন বাসস্থান কলকাতায় ফিরে এল।

এক সপ্তাহ বাদে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছোট্ট একটি সংবাদ পড়ে সে আতংকে শিউরে উঠলো।

'নৈনীতাল লেক-এ ভয়াবহ নৌকো-ডুবি। নৌকোটি উলটিয়ে দিয়ে তুজন আরোহী ঝাঁঝি পূর্ণ জলে ডুবে যায়। একজনকে মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

জলে ডুবে নিহত ব্যক্তি একজন ব্রিটিশ আর্মি অফিসার। তার নিমজ্জিত দেহ কিন্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

মানব ব্লাডহাউণ্ডের আশ্চর্য কাহিনী

শুনলে সবাই আমার মত তাজ্জব মানবেন। এও কি সম্ভব! হ্যাঁ সম্ভব। মানুষ আজ অনেক কিছু বিস্ময়কর কাজ করে চলেছে ঠিকই, তবে সেসবই বিজ্ঞানের সৌজন্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করে, বিজ্ঞানকে হার মানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী কিছু লোক তাদের সহজাত অলৌকিক ক্ষমতাবলে অপরাধী সন্ধানে এমন সব কাজ করে চলেছে তা বুঝি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় পুলিস বিভাগ ওদের যথার্থ নামকরণই করেছে—'মানব-ব্লাডহাউণ্ড'।

এরা প্রকৃতই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। অপরে যা চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, এরা সহজেই তা দেখতে পায়। অপরে যা বুঝতে পারে না বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এরা তা সহজাত ক্ষমতাবলে বুঝে ফেলে। আর এদের ঘ্রাণশক্তি বুঝি কুকুরের চেয়েও শতগুণে প্রবল।

এবার তাহলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে এদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতাসমূহের রূপ :

খাকী ইউনিফর্ম পরিহিত বিল্লি নামক কাঠকয়লার মত গায়ের রঙের কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি উবু হয়ে বসে তার মাকড়সাসম আঙুলগুলোকে প্রস্তরভূমির ওপর একবার এদিক একবার ওদিক করে বিলি কেটে যাচ্ছিল। পায়ের তলাকার পাথরের ওপর সে এমনভাবে হাত বোলাচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল কাউকে সে পরম স্নেহে আদর করে চলেছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে করবার পর সহসা মুখ তুলে পাশে দাঁড়ানো শ্বেতাঙ্গ পুলিস ইন্সপেকটরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, স্যর, এই

পথে, এই পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে সে ঘোড়ায় চেপে গেছে। লোকটা খুবই মোটাসোটা, খুব তাড়া ছিল তার। ঘোড়াটার পেছনের বাঁ দিকের পাটা কিছুটা খোঁড়া। লোকটা বেশী দূর যেতে পারে নি এখনো।

অতঃপর পশ্চিম দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে বললে, আমরা স্যর ঐদিকে গেলে এক কি দু-মাইলের মধ্যেই লোকটাকে পেয়ে যাব।

শ্বেতাঙ্গ সাহেব পায়ের তলাকার প্রস্তরভূমির দিকে বারেক তাকালো। মসৃণ, নিরেট, কড়া রোদে উত্তপ্ত প্রস্তরভূমি। তাতে দৃশ্যতঃ কোন চিহ্ন বা ছাপ দৃষ্ট হল না।

কিন্তু সাহেব প্রকৃত হতবাক্ই হল যখন তারা পশ্চিম দিকে মাইল দেড়েক এগিয়ে গেল দ্রুত। সেখানে দেখা গেল বিশালকায় এবং বদমেজাজী জনৈক পশুপালক ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে। সত্যিই দেখা গেল সেই ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পায়ের খুঁত থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। অচিরেই ওরা পাকড়াও করে ফেললো পলাতক সেই পশুচোরকে।

সাহেব পরে বিল্লিকে প্রশ্ন করেছিল—তুই কি করে ঐ মসৃণ চিহ্নহীন নিরেট একটা পাথরে এত কিছু দেখতে পেলি ?

ধূমপান করা কালো এক সারি দাঁত বের করে সহাস্যে সে জবাব দিল, আমি দেখি না 'বস্', আমি অনুভব করি, বুঝতে পারি।

বিল্লির কোন উপাধি নেই। সে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এক উপজাতীয়দের ছেলে। যারা পদচিহ্ন দেখে পিছু নিতে সক্ষম, এক্ষেত্রে অপরাধীদের গতিপথ অনুসরণে পারঙ্গম, তাদের বলা হয় 'ট্র্যাকার'। বিল্লি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত অঞ্চলে যে পুলিস বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ায়, সেই বিভাগে কাজ করে। কৃষ্ণাঙ্গ ১৮ জন যুবক এই মানব ব্লাডহাউণ্ডের কাজ করে

অফিসারদের সঙ্গে। আমাদের দেশে খুন হলে যেমন পুলিস কুকুর আনা হয়, তারা যেমন গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীদের পাকড়াও করে। এরাও তেমনি, তবে কুকুরদের চেয়ে আরও অনেক বেশী গুণে গুণান্বিত।

বিল্লি যা করলো সাহেবের মনে হল তা যেন কোন জাদু বা ডাকিনী বিদ্যাবল। আসলে কিন্তু তা নয়, এগুলো ওর এবং ওর সহকর্মী, কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের পক্ষে জলভাতের মত সহজ নিয়মমাফিক কর্তব্যকর্মমাত্র। বিজ্ঞানে যা পারে না ওরা ওদের অলৌকিক ক্ষমতাবলে তা অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। পাথরের গায়ে কয়েকটি-মাত্র অশ্বখুরের আঁচড় চিহ্ন দেখে এত বড় রহস্য উদঘাটন যেন ওদের কাছে কোন কাজই নয়।

আজ ওদেশে হেলিকপটার ও স্পটার প্লেন দিয়ে অঞ্চলসমূহ টহল দেওয়া ও তদারকি করা হয় বলে, এই কৃষ্ণাঙ্গ 'ট্র্যাকার'দের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র ৯৪ জন-এ এসে ঠেকেছে। তবুও বিজ্ঞানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই 'মানব ব্লাডহাউণ্ড'রা আজও উক্ত পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য বলেই গণ্য।

'প্রকৃত কোন জটিল ক্রিমিনাল সন্ধানে এতাবৎ আবিষ্কৃত যে কোন যন্ত্রের চেয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা হাজার গুণে কার্যকরী' একথা বলেছে অশ্বারোহী টেরিটোরি পুলিস বাহিনীর জনৈক জাদরেল অফিসার। তার মতে বিমান শুধুমাত্র লক্ষ্য করতে সক্ষম কিন্তু এই 'ট্র্যাকার'রা অনুমান করতেও পারে, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল এরা স্মরণশক্তিতে হাতিকেও হার মানায়।

শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের প্রথম যুগ থেকেই পুলিস ও সামরিক বিভাগ এই সব আদিম অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ স্কাউট (তখন এদের স্কাউট নামেই অভিহিত করা হত) নিযুক্ত করতে থাকে। প্রখ্যাত

'গ্রিফিন-কেস'-এর সময় থেকেই এই সব ক্ষীণাঙ্গ অঙ্গারবর্ণ, আজগুবী ধরনের চুল ও লোমওয়ালা আদিম অধিবাসীদের অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সাহেবরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুইন্সল্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জি নদীর ধারে দুজন পুলিস ট্রুপারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্লারমণ্ট খনির কর্মীদের মাহিনাবাবদ ১০,০০০ পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা খুনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

পুলিস পার্টির তদন্তকার্যে নেতৃত্ব নেয় ইন্সপেক্টর গ্রিফিন। সঙ্গে যায় ১৯ বছর বয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকার।

মৃতদেহদ্বয়ের নিকটে পাওয়া কিছু পায়ের ছাপের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই কৃষ্ণাঙ্গ আদিম অধিবাসী ছেলেটি। তারপর তাকালো পুলিস অফিসারের বুটের দিকে। পরমুহূর্তে সে অভিযুক্ত আঙ্গুল তুললো স্বয়ং তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রিফিনের পানে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপনি, ইন্সপেক্টর সাহেন আপনিই খুনী, এদের আপনিই খুন করেছেন।

সঙ্গে আসা অন্য পুলিস ট্রুপারদের নিরবিচ্ছিন্ন জেরার কবলে পড়ে একসময় গ্রিফিন ভেঙে পড়লো এবং সব কিছু স্বীকারোক্তিও করলো সবিস্তারে। উক্ত দুই কনস্টেবলকে গুলি করে মেরে সে-ই দশ হাজার পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা হাতিয়ে নিয়েছে। জুয়ার দেনাভারে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া ইন্সপেক্টর সাংঘাতিক অর্থের প্রয়োজনে নাকি এ কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, বলে জানায় সে।

ট্র্যাকার ছেলেটি গ্রিফিনের বুটকে তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা না করেই ওর পায়ের ছাপ চিনে ফেলেছিল। মাসখানেক বাদে 'গ্রিফিনের' ফাঁসি হয়ে যায়। এবং সেদিন থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ

ট্র্যাকাররা পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য কর্মিরূপে পরিগণিত হয়ে গেল।

বর্ণমালাসম পথরেখা পড়বার ক্ষমতা আদিম অধিবাসী প্রাচীন শিকারী উপজাতীদের মধ্যেই সর্বপ্রথম উন্মেষিত হয়। কেননা খাদ্যের প্রয়োজনে শিকার অনুসরণের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যে মহাদেশে তারা বাস করত তা সারা বিশ্বের মধ্যে শুষ্ক, তেমনি চরম অনুর্বর আর লালিত্যহীন। তাই অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের অপার্থিব ক্ষমতার বিকাশলাভ ঘটেছিল আহার সন্ধানের প্রয়োজনে।

যেহেতু তাদের খাদ্য ছিল যে কোন বস্তু বা প্রাণী, তাই সব কিছুরই গতিপথ অনুসরণে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো তারা। এমন কি প্রস্তরভূমিতে টিকটিকি, গিরগিটি বা সর্পকুলের চলাচলের চিহ্নও তারা ঠাহর করতে শিখলো।

জন্তু-জানোয়াররূপী শিকারকে অনুসরণ বা ধাওয়া করে অনেক সময় বিপুল পথ অতিক্রম করতে হত এবং তা পায়ে হেঁটেই। তাই তারা কালক্রমে হাঁটার বা দৌড়নোর ব্যাপারে অকল্পনীয় গতিবেগ ও সহ্যশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলো। শোনা যায় এমন আদিম অধিবাসী নাকি আকচার রয়েছে যারা দীর্ঘ পা ফেলে, আধা দৌড়ের কদমে, এক একদিনে সুদীর্ঘ ৯০ মাইল পথও একনাগাড়ে অতিক্রম করতে পারে। আবার শ্বেতাঙ্গ মানুষের ২৪ ঘণ্টায় যে আহার ও পানীয় লাগে, সেই একই পরিমাণ খাদ্যপানীয় খেয়ে সাত দিনেরও কম সময়ে টানা ৩০০ মাইল পথ পেরিয়ে যেতে পারে এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা।

যে পথ অতিক্রম করে তার তাৎক্ষণিক অনুলিপি করতেও ওরা সমান ওস্তাদ। শ্বেতাঙ্গ সাহেব বিল্লিকে দেখেছে ধুলোমাটিতে হাতের চেটো ও আঙুলের দ্বারা দ্রুতগামী প্রাণীদের অবিকল পদচিহ্ন একই দ্রুততায় আঁকতে।

—এই দেখুন স্যার ক্যাঙারুর পায়ের দাগ, বলে বিদ্যুৎগতিতে সে কনুই, হাত ও বুড়ো আঙুল দিয়ে ধুলোপথের উপর থপ থপ লাফিয়ে এমন ক্যাঙারুর পদচিহ্ন এঁকে দিল যা শ্বেতাঙ্গ মানুষের পক্ষে আসল বা নকল প্রভেদ করা অসম্ভব।

তারপর সে হাত দিয়ে সেই চিহ্নগুলোকে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট করে, কিছুটা টেনে টেনে চলা চিহ্ন এঁকে, সহাস্যে সাহেবকে বললে—এবারে স্যর ক্লান্ত হয়ে পড়া ক্যাঙারুর পায়ের ছাপ এটা।

এই কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকারদের অকল্পনীয় সাহায্য ব্যতিরেকে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের প্রস্তর মরুভূমি, রুক্ষধূসর প্রান্তর ও জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকা টহল দিয়ে শাসনে রাখা ওদেশের পুলিস বাহিনীর পক্ষে প্রকৃতপক্ষেই অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে নিরক্ষীয় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দান টেরিটরি।

ওদের নিয়ে একজন অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ ট্রুপার যে কোন ইংলিশ কাউন্টির চেয়ে দশ-বিশ গুণ বড় অঞ্চল অনায়াসে টহল দিয়ে ফেরে।

অধিকাংশক্ষেত্রে দুই কি তিনজন অশ্বারোহী ট্র্যাকার থাকে একজন সাহেব পুলিসের সঙ্গে। তবে স্পেশাল কোন কোন কেস্ এ ট্র্যাকার অনেক সময় একা একাই কাজ করে যায়। এবং এইসব সময় তারা অপরাধী পাকড়াও করে নিয়ে আসবেই আসবে।

অপরাধী হয়ত সপ্তাখানেক পথ এগিয়ে চলে গেছে, সে যে জায়গায়ই লুক্কায়িত থাক না কেন, কালক্রমে অনুসরণকারী এই 'মানব ব্লাডহাউণ্ড' ঠিক তাকে গিয়ে ধরে ফেলবে। এক হয় তাকে হাতকড়া আবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসবে, নয়ত নিজে সে প্রাণ দেবে।

পুলিসের দ্বারা পিছুধাওয়া হয়ে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ অপরাধীই বনেজঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে আশ্রয় নেয়। কেননা সেক্ষেত্রে তাদের বেশীদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু আদিম অধিবাসী

অনায়াসে এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয় বহুদিন। তখন এই স্বজাতীয় ক্রিমিনালদের ধরতে পারে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকাররাই।

এই ধরনের এক কুখ্যাত গণহত্যাকারী কৃষ্ণাঙ্গকে যে ট্রালর ছেলেটি পাকড়াও করে ধর্মাধিকরণে হাজির করেছিল, তার তুলনা বুঝি বিরল। সে বুঝি সমস্ত ট্র্যাকারদের মধ্যে সেরা।

নরহত্যাকারী উক্ত লোকটা ছিল দাড়িগোঁফওয়ালা বিরাট এক কালো দৈত্য বিশেষ। নাম তার নেমারলুক। তার ডাকাতি ও নরহত্যার ইতিহাস সুদীর্ঘ। হত্যার মিছিলে তার শেষ কুকর্মটি হল উত্তরাঞ্চলস্থিত ড্রেচারী উপসাগরের উপকূলে তিনজন মুক্তাসন্ধানী জাপানী ধীবরকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড।

এই দুর্দান্ত কালাপাহাড় দানবকে যে ধরতে গেল সে তার দেহের অর্ধেক সাইজের ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক ট্র্যাকার। নাম তার বুলবুল।

এই দুজনের লুকোচুরি বা চোর-পুলিস খেলা চললো রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তর ও বিশাল জলাভূমি ঘেরা পুরো একটি জেলার মত বড় ও বিস্তৃত স্থান জুড়ে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। তাকে পাকড়ও করতে সময় লেগেছিল পাকা আট মাস। এই সুদীর্ঘ সময় বুলবুল একা একাই বনে জঙ্গলে ঘুরেছিল।

নাছোড়বান্দা সেই অনুসরণপর্ব।

পলায়নরত নেমারলুক পথিমধ্যে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে অনুসরণকারীকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বহুবার, কিন্তু প্রতিবারেই সে বিফল হয়ে পালিয়েছে সামনের দিকে।

বুলবুল অবিরাম গতিতে অকল্পনীয় ধৈর্যসহকারে পিছু নিয়ে গেছে অপরাধীর। এ কথাও সে জানতো যদি তার শিকার প্রথমে তাকে দেখে ফেলে তো তার ইহলীলা তন্মুহূর্তে খতম হয়ে যাবে।

নেমারলুক এইভাবে অবিশ্বাস্য প্রায় ৪০০ মাইল পথ উন্মুক্ত

প্রান্তর এড়িয়ে, ঝোপজঙ্গল বনপথে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। এবং এই পলায়নপথে সিগারেট ও দেশলাই ছিনতাই করবার প্রয়োজনে কমপক্ষে আরও দুজন মানুষকে সে খুন করে এগিয়ে গেছে।

অবশেষে বুলবুলের অকল্পনীয় অধ্যবসায়ের এবং ধৈর্যের শেষ হল। সে একদা ঘুমন্ত অবস্থায় দানবাকৃতি অপরাধীকে পেয়ে তার ওপর সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হাতকড়ি-আবদ্ধ করে ফেলে। অপরাধীকে জেগে উঠে অস্ত্র ধরবার সময়ও দেয়নি এই ক্ষুদে ট্র্যাকার।

বুলবুলকে ওর সহকর্মী ট্র্যাকাররাও এক বিস্ময়কর মানবরূপে জ্ঞান করে। শোনা যায় সে ভরা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বুকে হেঁটে লুক্কায়িত অবস্থায় এমনভাবে এগিয়ে যেতে পারে যে বাইরে থেকে কোন মানুষ তা টেরই পাবে না চর্মচক্ষে। এমনকি ধানগাছগুলোতে সামান্যতম ঢেউও দৃশ্য হবে না।

কুইন্সল্যাণ্ডের ট্র্যাকার হ্যাপি অবশ্য বুলবুলের মত অতটা যশস্বী নয়। তবু গুণগত দিক দিয়ে সে তার খুবই কাছাকাছি বলা যায়। বিশেষ করে তার একটি অপরাধী সন্ধান তো তুলনাবিরল ঘটনা।

উইনটন নামক রগচটা একজন বড়লোক কৃষকের স্ত্রী রাতারাতি উধাও হয়ে যায় একদা। পুলিস কর্তৃপক্ষ এটাকে নরহত্যাজাতীয় ঘটনা বলে সন্দেহ করলো।

কৃষক ভদ্রলোক কিন্তু সরাসরি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বললে যে তার স্ত্রীর নাকি দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল, তাই হয়ত সে মনের দুঃখে কোথাও চলে গেছে।

পুলিস সেই মহিলার কোন পাত্তাই করতে পারলো না। তাদের এরপর আর করবারও কিছু রইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তারা শেষ চেষ্টা হিসাবে তাদের চ্যাম্পিয়ন ট্র্যাকার হ্যাপিকে লাগিয়ে

দিল এই রহস্য উদ্ঘাটনে। হ্যাপি নামটি রসিকতা করে রাখা। কেননা তার মুখমণ্ডল সদাই বিষণ্ণ ও বিষাদপূর্ণ থাকতো। আরেকটি কারণও ছিল, তা হল হ্যাপির স্বজাতীয় নামটি ছিল পরিপূর্ণ অনুচ্চারণযোগ্য।

সাহেব ওকে ডেকে বললে, এই ভদ্রলোকের স্ত্রী বেপাত্তা হয়েছেন, তাঁকে তোমায় খুঁজে বার করতেই হবে হ্যাপি।

বিরসবদনে হ্যাপি বিকৃত মুখ করে একসময় কাজে লেগে গেল। ফার্ম হাউসে বার কয়েক এলোমেলো পাক খেয়ে অবশেষে গেট পেরিয়ে প্রান্তরে নামলো সে। এগিয়ে যেতে লাগলো কাঁটাগুল্ম ঝোপের দিকে।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন শুঁকতে লাগলো। গাছের উপর হাত বুলিয়ে একসময় একটা সরু ডাল ভেঙে হাতে নিল, সেটাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফের এগিয়ে চললো।

সঙ্গী কনেস্টবলদের চোখে কিন্তু কোন প্রকার কিছু পড়লো না; এমনকি কোন পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্রও নয়।

তল্লাশী কার্য এইভাবে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ট্র্যাকার কখনো থামে, কখনো গুটিগুটি পায়ে চলে, পথরেখার প্রতিটি গজ সে শুঁকতে শুঁকতে ছুঁতে ছুঁতে চললো। এইভাবে আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করে একসময় একটা শুকনো নালার কাছে এসে হ্যাপি সহসা অতিশয় উত্তেজিত হয়ে পড়লো যেন। বলে উঠলো,—পাচ্ছি ...পাচ্ছি...গন্ধ পাচ্ছি আমি। প্রায় নিজের মনে কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে অতি শম্বুকগতিতে সে শুষ্ক নালা ধরে আরও নীচের দিকে এগিয়ে গেল।

অবশেষে সে একস্থানে নেমে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা জলাজমিতে আঘাত করতে করতে বলে উঠলো, এই স্থান খুঁড়ে দেখুন স্যার। এরই তলায় রয়েছে শ্বেতাঙ্গিনী মেম মেরী।

মাটি খুঁড়ে সত্যিসত্যিই সেখানে পাওয়া গেল কৃষক পত্নী মেরীর মৃতদেহ। শবের মস্তকটি প্রবল আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেল।

কৃষক উইনটন বাদবাকী জীবনের মত জেলে চলে গেল। আর বিষণ্ণ বিষাদমুখো হ্যাপি ফিরে গেল তার সহিসের কাজে, পুলিস ঘোড়াদের পরিচর্যা করতে।

অপরাধী সন্ধান ছাড়াও এই ট্র্যাকাররা আরেকটি বিষয়েও খুবই পারদর্শী। তা হল, শ্বেতাঙ্গদের টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকেও হার মানানো এক অভিনব বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি।

অদূর স্থানের জন্য ওরা দুটি কাঠিকে মেসিনগানের মত দ্রুততায় বাজিয়ে ওদের নিজস্ব কোড্-ভাষায় সংবাদ প্রেরণে সক্ষম।

আবার দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য আরেক প্রকার অভিনব পদ্ধতি। প্রথমে যার কথা বলা হয়েছে, সেই বিল্লি একজন সাহেবকে এই পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়েছিল। সেটা হল ধোঁয়া-সিগন্যাল।

সে প্রথমে অগ্রভাগ সরু ঝুড়ি আকারের এক আগুন জ্বাললো গাছের অজস্র ডালপালা দিয়ে। ডাল দিয়ে আগুন, আর পাতা জ্বেলে ধোঁয়া। অতঃপর ঘাসে বোনা একটি মাদুর দিয়ে সে ধোঁয়াকে চেপে ধরে এক এক সময় এক এক প্রকার ধোঁয়া বের করতে লাগলো সেই মাদুরের ফাঁক দিয়ে।

কখনো গোল, কখনো রিং আকৃতি, কখনো লম্বা, কখনো হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ, এইভাবে বিভিন্ন প্রকার ধোঁয়া বের করে তাদের অদ্ভুত সংকেত-বার্তা পাঠাতে লাগলো দৃশ্যমান দূরাঞ্চলে।

চীনে ভাষার মত এক একটি আকৃতির ধোঁয়ায় নাকি অনেক কিছু একবারেই বোঝায়। এক একটি সংকেত এক একটি বাক্য-বিশেষ।

যেমন দুটো গোলাকৃতি ধোঁয়ায় বোঝাবে ভয়াবহ মৃত্যু। লম্বা

লাঠির মত ধোঁয়ায় বোঝাবে জন্ত দৃশ্যমান হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহামূল্যবান এই ট্র্যাকারদের একটা অসুবিধা রয়েছে তা হল নিজ উপজাতি ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকলে ওরা ওদের উক্ত অলৌকিক ক্ষমতা কালক্রমে হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ নৈকট্য থেকে বেশ কিছু বছর বাইরে থাকলে ওদের সূক্ষ্ম প্রতিভাগুলি কালক্রমে ভোঁতা হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এবং বাদবাকী জীবন ওরা সাধারণ নগণ্য মানুষে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জন্যেই মাঝে মাঝে ওদের ছুটি দেওয়া হয় স্বজাতীয়দের সঙ্গে বনেজঙ্গলের গাঁয়ে বসবাস করে আসার জন্য।

ফায়ার ওয়াকিং-এর আজব কাহিনী

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত মার্কিন ফুলব্রাইট প্রফেসার লিওনার্ড ফেনবার্গ-এর মুখেই শোনা গেল এই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ।

—বিশ্বাস করুন আমি স্বচক্ষে দেখেছি দগদগে কাঠের আগুনের উপর দিয়ে মানুষদের হেঁটে যেতে। মিঃ ফেনবার্গ বললেন।

—বলেন কি, পুড়ে গেল না তাদের পা?

—তাহলে আর বলছি কি, পোড়া বা ঝলসানো দূর স্থান, এতটুকু ফোসকার চিহ্নমাত্রও কোথাও দেখা গেল না।

—বলেন কি! এ তো দেখছি পরমাশ্চর্য অলৌকিক ব্যাপার!

—প্রকৃতই তাই। এসব ঘটনা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না। তাহলে শুনুন আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতার এক কাহিনী। আমি তখন সিংহলে বাস করি।

প্রথম দেখি একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বারো ফুট দীর্ঘ কাঠের আগুনের ওপর দিয়ে চারজন মানুষকে অনায়াসে হেঁটে যেতে।

দ্বিতীয়বার জনৈক সিংহলী ভদ্রলোকের খামারবাড়িতে আমাদের মনোরঞ্জনার্থে ছ'জন লোক দিয়ে আগুনে-হাঁটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন তিনি।

এ হল দু-চারজনের খুচরো ব্যাপার। এরপর একদা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলাম ও-দেশীয় প্রখ্যাত এবং প্রত্যক্ষ এক দেবস্থানে দলে দলে জনগণের অগ্নির ওপর দিয়ে যাকে বলে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে জন-হণ্টন অনুষ্ঠান। রোমাঞ্চিত হয়ে তাজ্জব দৃষ্টিতে হতভম্ব ভাব নিয়ে সেই শঙ্কাশিহরণ দৃশ্য দেখা একটা অভিজ্ঞতার মত অভিজ্ঞতাই বটে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সিংহলের এক জঙ্গলের মধ্যে এই মন্দির। সে

মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে স্থানীয় হিন্দুদের দেবতা কাটারাগামা। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেবতা।

প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন সেখানে হয় পরম উৎসব অনুষ্ঠান। শেষ দিনে হয় এই আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটার কর্মসূচী।

সিংহল দ্বীপের যাবতীয় স্থান থেকে তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীরা আসতে থাকে দলে দলে। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আসে।

উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে অরণ্যমধ্যস্থ তীর্থস্থানটি। ভক্তরা লাল নীল কাগজে গাছপালা সাজায়, নির্দিষ্ট প্রস্তরে নারকেল ভেঙ্গে পূজা দেয়। যতই দিন এগোতে থাকে সপ্তাহের পূজা উপাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং আচার আচরণের বৈচিত্র্যও রমরমা হয়ে ওঠে। ভক্তরা নানা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরাধনার প্রকাশ করতে থাকে। কেউ কেউ পিন-এর দ্বারা দুই গালে শত শত আঘাত করে রক্তদান করে, কেউ পেরেক কণ্টকিত বস্তুর ওপর খালি পায়ে হেঁটে বেড়ায়, কেউ কেউ আবার নিজেদের মাংসপেশীর মধ্যে বড় লোহার বঁড়শির মত হুক ঢুকিযে নিয়ে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে মালবোঝাই ঠেলাগাড়ি উঁচুনিচু পথের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলে। সবই দেবতার কৃপালাভের আশায় ভক্তদের কল্পনাতীত বেদনা ও কষ্ট সহনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।

রাত যত বাড়ে, জনতার উৎসাহ উদ্দীপনাও তত বাড়ে। এই-ভাবে বাড়তে বাড়তে মধ্যরাত্রিতে তা বুঝি চরমে এসে পৌঁছল। তখন দেখা গেল ছয় ফুট চওড়া ও কুড়ি ফুট লম্বা চতুষ্কোণ এক ভূমিখণ্ডের উপর ঘণ্টা চারেক ধরে কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে। কাঠগুলো পুড়ে দগদগে লাল হতে, ক'জন লোক আশপাশ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে চেলে সেগুলোকে সমানভাবে লেভেল করে দিতে লাগলো যাতে এর উপর দিয়ে পদচারণা করতে সুবিধে হয়। দুরু দুরু উত্তেজনায় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের দেহমন উত্তাল।

অগ্নির উপর হন্টনানুষ্ঠান হবে শেষ রাত্রি চারটের সময়। অগ্নিবেদী থেকে ক্রমশ লোক নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো। কারণ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠছিল।

অগ্নিবেদীর চারদিকের জনতার অধিকাংশই বেশ কিছু দিন পূর্ব হতেই তাদের সুবিধেমত আসন গ্রহণ করে বসে আছে। সেখানেই আহার বিহার, শয়ন-নিদ্রা, এমন কি মূত্রাদি ত্যাগ পর্যন্ত, কেননা স্থান ত্যাগ করলে তা বেদখল হয়ে যাবার আশঙ্কা।

ভক্তদের কাছে আগুনে হাঁটা অনুষ্ঠান দর্শন একটি পবিত্র ধর্মবিশেষ। এ দৃশ্য দেখা মানে পরমেশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা ও কৃপা উপলব্ধি করারই সমান।

থেকে থেকে ভক্তবৃন্দ "হর" "হর" ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলছে স্থানটি।

রাত দুটোর সময় অকস্মাৎ জনতা পথ করে দিল একটি মেয়েকে। দু হাতে সে ধরে রেখেছে নারকেল ছোবড়ার আগুনে লাল হয়ে ওঠা একটি মাটির পাত্র। খালি হাতে ধরে আছে গনগনে আগুনের উত্তাপ। কিন্তু তার মুখ চোখ আচার আচরণে নেই এতটুকু বেদনা বা অস্বস্তির আভাস। কেমন একটা আচ্ছন্নের মত ভাব তার অভিব্যক্তিতে। সে গিয়ে সেই অগ্নিভরা পাত্রটি মন্দিরের দরজার সামনে রাখলো। তার হাতের চেটো কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ, কিন্তু পোড়ার কোন চিহ্ন নেই। মেয়েটি এসেছে তার কোন মানত নিয়ে, এইভাবে সে এনেছে উপচার।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরেকটি মেয়ে এল। সেও এনেছে একই প্রকার আগুনে ভরা মাটির পাত্র। তবে সে সিংহলের নিয়মানুযায়ী তা মাথায় বহন করে এনেছে। যখন সে পাত্রটি মন্দির চত্বরে স্থাপন করলো দেখা গেল তার মাথায় অতটুকু আঁচড় লাগেনি বা একটি চুলও দগ্ধ হয়নি। হাতও তেমনি তরতাজা অদগ্ধ অবস্থায়ই রয়েছে।

রাত তখন ঠিক চারটে। সহসা উত্থিত হল ঢাকঢোল ও বাঁশির আওয়াজ। বোঝা গেল আগুনে-হাঁটিয়ের দল আসছে অকুস্থলে। দীর্ঘ মিছিলের নেতৃত্ব করে নিয়ে আসছেন শ্বেতশুভ্র পোশাকধারী জনৈক পুরোহিত। সবারই মুখমণ্ডল লাল-হলদে ও শাদা রঙের ছাই-এর দ্বারা বিচিত্রিত।

চতুষ্কোণ অগ্নিকুণ্ড তখন বেশ সুসমভাবে গনগনে অবস্থায় জ্বলছিল রক্তবর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে। দু'জন লোক পুনরায় বাঁশ দিয়ে চেলে চেলে অগ্নিক্ষেত্রটি লেভেল করে দিল। আগুনের সে কি উত্তাপ। তার দশ ফুটের মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টসাধ্য।

পুরোহিত উচ্চঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলো। একসময় তার কণ্ঠ ডুবে গেল প্রবল ধ্বনিতে পরছুনে বেজে ওঠা বহু ঢাকঢোল ও বাঁশির আওয়াজে। চরম লগ্ন উপস্থিত। জনতার উত্তেজনাও চরমে উঠে গেছে।

শুরু হয়ে গেল ভক্তদের আগুনের ওপর দিয়ে মিছিল করে দলগত হাঁটা। আশিজন পদচারীর মধ্যে দশজন ছিল স্ত্রীলোক। সেই হই-হট্টগোল, আগুনের রক্তিমাভ উজ্জ্বল্যের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা হাঁটিয়েদের মনে হচ্ছিল ছায়া মিছিলের কালো কালো একদল সঞ্চরণশীল মানবাকৃতি।

কর্ণপটহবিদারী বাজনা, সমবেত জনতার উত্তেজিত উন্মত্ত উল্লাস ও জয়ধ্বনি, অসমসাহসিক ভক্তবৃন্দের শঙ্কাশিহরণ দৃশ্যের অবতারণা প্রভৃতিতে শেষ রাতের অরণ্যঘেরা কাটারাগামা দেবের তীর্থস্থান যেন কাঁপতে লাগলো।

কিছু লোক লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েকটি পদক্ষেপে পার হল অগ্নিক্ষেত্র। কিছু ভক্ত একই গতিতে দৌড়ে পার হল তা। কেউ আরও দ্রুত বর্শা হাতে আক্রমণকারীর ভঙ্গিতে অতিক্রম করলো অগ্নিকুণ্ডের কুড়ি ফুট। একজন লোক বেশ পুলকিত চিত্তে উদ্বাহু

হয়ে অগ্নিবেদীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে নৃত্য করলো খানিকক্ষণ। বনবন করে ঘুরলো সেই অবস্থায় লাট্টুর মত। আর একটি লোক অকস্মাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আগুনের মাঝখানে। দর্শকগণ চরম আতঙ্কে হায় হায় করে উঠলো। লোকটি কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে ফের উঠে পড়ে বীরদর্পে পার হয়ে গেল তা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দর্শকবৃন্দ, দুটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে সখীর মত নাচতে নাচতে পার হয়ে গেল অসহনীয় উত্তাপের দগদগে অগ্নিক্ষেত্র।

একজন শ্বেত পোশাক পরিহিত মানুষ, বহুক্ষণ ধরে অগ্নিচারীদের দেখছিল। অবশেষে সে ধীরে অতি ধীরে দুলকিচালে আগুনের উপর উঠে, যেন দুনিয়ায় তার আর কোন তাড়া নেই, এমন অস্বাভাবিক শ্লথ গতিতে দীর্ঘ আগুন-পথটা হেঁটে গিয়ে নিস্পৃহ-ভাবে মাটি স্পর্শ করলো।

অগ্নি পরিক্রমা শেষ হবার পর ভক্তরা গিয়ে মন্দিরের দরজার কাছে সমবেত হল টলতে টলতে। সেখানে প্রধান পুরোহিত এসে প্রত্যেকের কপালে পীতবর্ণ ছাই এর লম্বা ফোঁটা এঁকে দিলেন।

আগুনের উপর হাঁটা দু ধরনের। একটা হল, আগ্নেয়গিরির অতি উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর পদচারণা (যেমন হয় পলিনেশিয়া অঞ্চলে) আর দ্বিতীয় প্রকার হল, প্রকৃত কাষ্ঠাগ্নি করে তার ওপর হাঁটা (এগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে প্রচলিত)।

এই আগুনের উপর বিচরণের রহস্য ব্যাখ্যা করা হয় তিন ভাগে বিভক্ত করে; যথা: শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয়।

১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কাউন্সিলের বৈজ্ঞানিকগণ এই আগুনে-হাঁটা-রহস্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সারেতে দুই পর্যায়ে অগ্নি বিচরণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

কাউন্সিল স্বয়ং অগ্নিকুণ্ড বা বেদী তৈরি করা থেকে কাষ্ঠাগ্নি প্রজ্জ্বলন পর্যন্ত যাবতীয় কাজে নিজ হাতে করেন, যাতে কোন প্রকার

ছল চাতুরী বা তঞ্চকতার প্রবেশলাভ না ঘটতে পারে। ঘটনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও পর্যায় সরজমিনে পরীক্ষা করে দেখবার মানসে ঐ কাউন্সিল একদল ডাক্তার, কেমিস্ট, শারীরবিদ, এবং অক্সফোর্ড-এর কিছু অধ্যাপকদের নিয়োজিত করেছিল।

কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক আলাদা আলাদা ভাবে রিপোর্ট পেশ করে। মোটামুটিভাবে সবাইই এই অগ্নি-বিচরণ রহস্য বিষয়ে শারীরিক কোন না কোন ক্ষমতার উপরই জোর দেয়। কিন্তু কি সে ক্ষমতা, তা কিন্তু কেউ নির্দিষ্ট করে একমত হয়ে বলতে পারে নি।

সারে-টেষ্টএর প্রথম বার, খুদাবক্স নামক জনৈক ভারতীয় কোন প্রকার দগ্ধ বা আহত না হয়ে অগ্নি ছড়ানো জমির উপর দিয়ে হেঁটে যায় অক্লেশে। সে আগুনের উপরিভাগের উত্তাপ ছিল ৪৩০° সেঃ। আর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ছিল ১৪০০° সেঃ।

আর ১৯৩৬-এর দ্বিতীয় টেস্ট-এ আহমেদ হুসেন নামক অপর এক ব্যক্তি, অগ্নিকুণ্ডের উপরিভাগের উত্তাপ ৫০০° সেঃ-এর উপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যায়।

এই দু'জনই বলে যে তাদের এই কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাদের অকৃত্রিম বিশ্বাস। হুসেন এও বলে যে সে ইচ্ছে করলে তার ক্ষমতা তার সঙ্গে আগুনে হাঁটা অপর যে কোন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারে।

একথা শুনে অর্ধ ডজন ইংরেজ অ্যামেচার হুসেনের পেছন পেছন আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। সত্যি সত্যিই তাদের পা তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে আদৌ দগ্ধ হয় নি।

এদের একজন আবার কদিন বাদে তিন পদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে যায় এতটুকু দগ্ধ না হয়ে।

কাউন্সিলের বিজ্ঞানীগণ শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন যে এই আগুনে

হাঁটা বস্তুটা জিমনাষ্টিকের রকমফের ছাড়া আর কিছু নয়। সীমিত সংখ্যক দ্রুত কয়েকটা একই ধরনের পদক্ষেপ যদি দেওয়া যায়, তাহলে ঐ নিম্ন মানের উত্তাপে চামড়া কখনই পোড়ে না। আসলে অগ্নিবিচরণের গোপন রহস্য হল জ্বলন্ত কাঠের নিম্ন মানের উত্তাপ ধারণ ও সঞ্চালন ক্ষমতা। এই অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ যদি প্রতি পদক্ষেপে আধ সেকেণ্ডের বেশী না হয়, তাহলে সেই আগুন চামড়ার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না (তামার উত্তাপ পরিচালন বা ধারণ ক্ষমতা কাঠের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী)।

বিজ্ঞানীরা আরও বললেন পদচারীদের দেহের ওজনের কথাও বিবেচ্য। ভারতীয় দুজনের ওজন ছিল ১২৬ পাউণ্ডেরও কম। অতএব তাদের চাপ ওজনদার মানুষের পায়ের চাপের চেয়ে অনেক হালকা হবে জ্বলন্ত কাঠের ওপর। মোটা মানুষের চেয়ে তাদের পদক্ষেপও বেশী দ্রুত হবে। এ ব্যাপারে দক্ষতার উপরেও সাফল্য নির্ভর করে। এক্সপার্ট পদচারী যত সহজে অনিষ্ট এড়িয়ে দ্রুত ও হালকা পদক্ষেপে অগ্নিক্ষেত্র পার হতে পারবে, আনাড়ী মানুষ তা কখনই পারবে না।

কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা এ অভিমত দিলেন যে প্রাচ্যের মানুষদের পায়ের তলাকার চামড়া 'মোটা এবং অনেক বেশী 'সহনশীল। ফলে কিছুটা 'ফায়ার প্রুফ'। প্রাচ্যের মানুষেরা সারাজীবন 'খালি পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত। তারা প্রায়শঃ উত্তপ্ত ভূমির ওপর দিয়েই হাঁটাচলা করে। তারা অনেক সময় পায়ের আঙ্গুলের চাপে 'জ্বলন্ত 'সিগারেট নিভিয়ে ফেলে, ইত্যাদি।

কথাটা সত্যি। কিন্তু ইংরেজ ডাক্তার যিনি খুদাবক্স ও আহমেদ হুসেনের পা পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর মতে এদের উভয়েরই পায়ের 'তলা অতি 'কোমল ছিল এবং কাঠিন্যের কোন চিহ্নমাত্রও ছিল না।

আরেকটি সন্দেহের কথাও বিজ্ঞানীরা বললেন, পদচারীরা

বোধকরি পায়ের তলায় কোন প্রকার কেমিক্যাল-এর প্রলেপ দিয়ে নেয় যা তাদের অগ্নিদগ্ধতা থেকে রক্ষা করে।

জনৈক মার্কিন জাদুকর বললেন, ফটকিরির সঙ্গে লবণ দিয়ে মলম করে পায়ের তলায় লাগিয়ে নেয় ওরা। কেউ বা বলল, সোডা কিংবা সাবান বা রহস্যময় কোন গাছগাছড়ার রস কিংবা কোন প্রকার অবশকারী বস্তু ওরা অবশ্যই মাখিয়ে নেয় পায়ের নীচে।

কিন্তু সারে-তে খুদাবক্স বা আহমেদ হুসেনের পায়ের তলা যেসব কেমিস্টগণ পরীক্ষা করেছেন পূর্বাহ্নে, তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে ওদের পায়ে কোন কিছুই মাখানো ছিল না। তবু তাঁরা খুদাবক্সের একটি পা ভালভাবে ধুয়ে মুছে দিয়েছিলেন কি হয় দেখবার জন্য।

"জলীয় বাষ্পের দ্বারা প্রতিরোধ"—থিয়োরীর বহু সমর্থক পাওয়া গেল।

সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান কেমিস্ট একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে লিখলেন যে তিনি উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে আরামেই হেঁটে যেতে পারেন। কিংবা পারেন লাল হয়ে ওঠা উত্তপ্ত লোহাতে বেদনাবোধহীন ভাবে নিজ জিভ ঠেকাতে। উচ্চ মাত্রার তাপাঙ্কের বিশেষ এক পর্যায়ে জলের হালকা প্রলেপ উত্তাপ থেকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে থাকে।

কিন্তু এই থিয়োরীর মুশকিল হল যে সারে-তে অনুষ্ঠিত টেস্টে এ প্রণালী আদৌ খাটলো না। প্রথমতঃ, এটা প্রমাণিত সত্য যে আগুনে হাঁটিয়েদের পা সর্বৈব শুকনো ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আগুনে হাঁটার মুখে একই পরিমাণ সমতা রেখে পায়ের তলায় জল সরবরাহ করা স্রেফ পাগলের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃতীয়তঃ, ভিজে পা বা আর্দ্রতা থাকলে তো সর্বনাশ, ভিজে পায়ের তলা আগুনে আটকে যেতে বাধ্য, এর ফলে ফোসকা অবশ্যম্ভাবী।

তবু আরেকটি ব্যাখ্যা ছাড়লেন জোসেফ ডানিথার নামক জাপান ঘুরে আসা এক ভদ্রলোক। তিনি জানালেন, শিন্টো পুরোহিতরা জাপানে একটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে আগুনে হাঁটার ব্যাপারে। তাঁরা অগ্নিক্ষেত্রের মাঝখানটায় রাখে হালকা আগুন। চতুষ্কোণের চারপাশে কিনারায় থাকে গভীর ও ভারী আগুন। অর্থাৎ আগে মাঝখানটায় আগুন জ্বলে, পরে চারপাশে। জ্বলতে জ্বলতে মাঝখানের আগুন আগেই নিস্তেজ হয়ে আসে। পুরোহিত তখন সেই আধা ঠাণ্ডা ছাইয়ের ওপর পদচারণা শুরু করে। যেহেতু চতুষ্পার্শ্বস্থ আগুন তখন প্রখর, দর্শকদের মনে হয় পুরোহিতরা কি এক অসাধ্যসাধনই না করছেন।

শিন্টো পুরোহিতদের গোপন রহস্য হয়ত এরকম হতে পারে। তবে এটা কোনক্রমেই সারে-র ঘটনায় প্রযোজ্য হতে পারে না। যেহেতু বিজ্ঞানীদের সতর্ক তত্ত্বাবধানেই সেখানকার আগুন চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের প্রতি স্থানে সম-উত্তপ্ত ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই তো গেল বিভিন্ন সমালোচকের শারীরিক দিকের ব্যাখ্যা। এবার দেখা যাক মনস্তত্ত্বওয়ালারা কি বলে ?

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার পার্সিভাল লোয়েল কয়েক বছর আগে একটি আগুনে হাঁটা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন যে এটা সম্ভব হয় প্রাচ্যদেশীয় মানুষজনের নার্ভসিস্টেমের স্পর্শকাতরতাহীনতার জন্যে, এর সঙ্গে আছে তাদেব তদ্গত মোহাচ্ছন্ন 'ভাবের ভর'। পায়ের তলার পুরু চামড়ার কাঠিন্যও কম সাহায্য করে না। সাইকোলজিস্টদের মতে, সম্মোহনই হল এ কার্যের গোপন রহস্য। অগ্নি-পদচারীদের নাকি আগেই সম্মোহিত করে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীকে শেষ মুহূর্তে নির্দেশ দেওয়ার নামে আসলে পুরোহিত তাকে হিপনোটাইজ করে দেয়। অতঃপর পদচারণা শেষে যখন ছাই-এর ফোঁটা দেয় সে সময়

পুরোহিত সম্মোহন ভঙ্গ করে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের এই সিদ্ধান্ত আদৌ খাটে না এসব ক্ষেত্রে, যেহেতু সম্মোহনে বেদনা অনুভবশক্তি অপসৃত হলেও, তার চামড়াকে পোড়ানো রদ করবে কিভাবে।

প্রাচ্যের যোগী ও ফকিররা বিশেষ শক্তিবলে একনিষ্ঠ মন-সংযোগের পরাকাষ্ঠা করতে সক্ষম নানাবিধ যোগাভ্যাসের দ্বারা। ঐ রকম তদ্গত ভাবের ঘোরে তাঁরা পেরেকের বিছানায় অর্থাৎ কণ্টকশয্যায় শুতে সক্ষম হন, হস্তদ্বয়কে সামনের দিকে তুলে রাখতে পারেন একটানা কয়েক দিন, কিংবা দেহকে ধীরস্থির নিথর নিষ্কম্প করে রাখতে পারেন সপ্তাহব্যাপী। এমনি আরও সব বিস্ময়কর বস্তু তাঁরা করতে সক্ষম যার বাস্তব মূল্য হয়ত বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তারা স্বীয় দেহকে এমনই নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে ফেলেন যা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

এইসব যোগীগণ কঠোর যোগাভ্যাসের দ্বারা এমন অবস্থায় পৌঁছে যান যখন তাঁরা বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁদের আত্মাকে দেহ থেকে বিছিন্ন করে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। সেই আত্মাচ্যুত দেহে কোন ব্যথা বেদনাই অনুভূত হয় না।

কিন্তু আগুনে হাঁটার ব্যাপারে এ থিয়োরীও খাটে না। কেননা মৃতদেহও তো আগুনে পুড়ে যায়।

সিংহলী ভক্তদের আগুনে হাঁটার ক্ষমতা বা শক্তি আসে তাদের আরাধ্য দেবতা কাটারাগামার প্রতি অচলা ভক্তি-বিশ্বাসের দরুন।

এই দেবতা খুবই প্রত্যক্ষ দেবতা। যে কোন বিপদে, তা সে কঠিন অসুখ, বা দেউলিয়ার আশঙ্কা, শত্রুর আক্রমণের ভয় ইত্যাদি থেকে মুক্তির প্রার্থনায় নর বা নারীরা কাটারাগামার কৃপাভিক্ষার মানসে মানত করে এই আগুনে হাঁটার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল হবার শপথ নেয়। দেবতা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

সুতরাং এইসব ভক্তরা আদৌ পেশাদারী অগ্নি পদাতিক নয়।

এরা প্রকৃতই অ্যামেচার এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ। শ্রাবণী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠান। কিন্তু এদের প্রস্তুতি শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে। এইসব দেবকৃপাপ্রার্থী ভক্ত মানুষেরা দেবস্থানে তিন মাস আগে থেকে এসে প্রধান পুরোহিতের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। তিন মাস তারা আচারে আচরণে আহারে বিহারে পবিত্র শুদ্ধ জীবনযাপন করে। নিরামিষ খায়, শুধু মাত্র জলপান করে সর্বপ্রকার জাগতিক আমোদ আহ্লাদ পরিহার করে। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পুণ্যস্রোতা নদীতে স্নান করে এবং পুরোহিতের নির্দেশানুসারে পূজা অর্চনা তপঃ ও ধ্যানসহ পুরোপুরি সাত্ত্বিক জীবনযাপন করে প্রস্তুত হয়ে ওঠে শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্য রাতের জন্য। এইভাবে বিশুদ্ধ জীবনযাপনান্তে যদি নিঃসীম আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তারা কাটারাগামার প্রতি নিরঙ্কুশ ভক্তি আনতে সক্ষম হয়, তবেই তারা অক্ষতভাবে অকুতোভয়ে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। সাধনা ও ভক্তিতে ত্রুটি থাকলে তারা বিফল হয়।

যে রাতে আমি ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলাম, সেদিনকার প্রতিযোগীদের মধ্যে বারোজন মানুষ এমন অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেল যে তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হল। একজনের আবার মৃত্যু হল সেখানে। বিশ্বাসীদের মতে এদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বা ভক্তিতে অবশ্যই কোন ত্রুটি বা ফাঁকি ছিল। তাই এই বিপত্তি।

এক বিধর্মীর শাস্তি হয়ে যায় কয়েক বছর পূর্বে। ইংরেজ খ্রীষ্টান এক যুবক পাদরী কাটারাগামার স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে হিন্দুদের যেমন ধর্মবিশ্বাস প্রবল তেমনি খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসও কিছু কমতি যায় না। এই বলে সে দর্পভরে স্বেচ্ছায় আগুনে হাঁটার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

ফলে তাকে পরবর্তী ছয় মাস হাসপাতালে কাটাতে হয় গুরুতর দগ্ধাবস্থায়।

সিংহলীদের মতে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ চৌদ্দ মাইল ব্যাপী স্থানের ওপর কাটারাগামা দেবতার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বা নিঃসীম ক্ষমতা বিদ্যমান।

কাটারাগামার 'বিরাট' মনুষ্যাকারের মূর্তি দৃষ্টে বোঝা যায় তিনি অতি 'নয়নমনোহর' সুন্দরদেহী' দেবতা। সাত ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই দেবতার 'ছয়টি মুখ। বাহন হিসেবে রয়েছে' ময়ূর। পাশে দাঁড়ানো দুজন নারীমূর্তি। হিন্দুর দেবতা হলেও কাটারাগামাকে বৌদ্ধরাও অনেকে ভজনা করে থাকে। এই দেবতা 'রণ ও 'প্রতিহিংসার দেবতা। সিংহলীরা অপরাপর দেবতার চেয়ে এঁকেই সবিশেষ ভয়ভক্তি সহকারে পূজা করে থাকে। এ দেবতার পূজায় কোন ত্রুটি হলে আর রক্ষে নেই। তাকে তাঁর রুদ্ররোষে পড়তেই হবে। অধিকাংশ সিংহলীরা বছরে অন্ততঃ একবার এসে কাটারাগামাকে অবশ্যই দর্শন করে যাবে। বিশেষ করে শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতে। এই দেবস্থান বা তীর্থস্থানে নিজের বাড়ি থেকে আগাগোড়া হেঁটে আসা নাকি মহাপুণ্যের কাজ। অনেকে তাই আসে।

আমরা যেবার কাটারাগামার কাছে যাই সেবার আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ছিল একজন সিংহলী যুবক। সে আমাকে তার নাম বললো 'এলভিস। ইতিপূর্বে একজন ইংরেজের কাছে সে বলেছে: 'উইনস্টন।

যতই 'দিন এগোতে লাগলো তার গাড়ি চালনা যেন কেমন 'এলোমেলো' অনিয়মিত হয়ে উঠলো। কারণ জানতে চাইলে সে স্বীকার করে ফেললো যে যদিও সে 'বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তবু তার 'কাটারাগামার প্রতি 'অচলা ভক্তি বিদ্যমান, তাই সে সারাদিন 'উপোস করেই গাড়ি চালাচ্ছে।

স্থানীয় একটি সংস্কার অনুযায়ী উক্ত দেবস্থানে সম্ভাব্য পৌঁছনোর সময় কখনো আগে থেকে উল্লেখ করতে নেই ড্রাইভার

এলভিস আমাদের জানায়, তাহলেই সর্বনাশ। কত দেরীতে যে পৌঁছনো হবে তার আর কোন ঠিক নেই। আরেকটা ভয়াবহ ব্যাপার হল, কাটারাগামা সম্পর্কে কোন প্রকার অসম্মানজনক উক্তি, তাহলে আর রক্ষে নেই।

আমাদের সঙ্গী রেনাল্ট গাড়ির আরোহী জনৈক বৌদ্ধ সেই ভুলই করলো। বললো, আবহাওয়া অতি চমৎকার, অতএব আমরা কাটারাগামাতে ছটার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

ভক্সল গাড়ির আরোহিণী জনৈকা ইংরেজ মহিলা বললেন যে কাটারাগামার প্রতি এত ভীত ও সমীহভাব একটি ননসেন্স বিশেষ। তিনি নাকি আগের বছর এখানে এসে এইসব দেবতা ও ভক্তদের নানারূপে টিটকিরি করে গেছেন। কই তাঁর তো কিছুই হয়নি তাতে?

পথিমধ্যে গাড়ি থামিয়ে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছিলাম। পুনরায় যাত্রা শুরু হল। উপরোক্ত গাড়ি দুটি আগে আগে গেল, আমরা আমাদের ভক্সওয়াগন নিয়ে তাদের পেছন পেছন চললাম।

সহসা, বলা নেই কওয়া নেই দারুন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক সময়ের মাত্র বৃষ্টি। পরে জেনেছিলাম এ বৃষ্টি নাকি মাত্র কয়েক শ গজ ব্যাপী হয়েছিল। আশেপাশে আর কোথাও হয়নি।

সে যাই হোক এর কয়েক মিনিট বাদে পিচ্ছিল পথে যেই আমরা একটা বাঁক ঘুরেছি অকস্মাৎ নজরে পড়লো আমাদের অগ্রবর্তী গাড়ি দুটি আমাদের মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ব্যাপার কি? দেখা গেল রেনাল্ট গাড়ির হুড পাথরের দেয়ালে ধাক্কা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আর ভক্সল গাড়িটিও পাহাড়ের গায়ে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

শোনা গেল চাকা পিছলে গিয়ে রেনাল্ট গাড়ির মুখ বেসামাল

হয়ে পেছন দিক ঘুরে যায়। মুখোমুখি ধাক্কা লাগা থেকে বাঁচবার জন্য পেছনের ভক্সল গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষে। ব্রেক কার্যকরী হয় না পেছল পাহাড়ে রাস্তায়। দুটি গাড়ি এসে পাহাড়ের দেয়ালে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা মেরে জড়াজড়ি অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

সেই অহংকারী দর্পিতা ইংরেজ মহিলাটি ছাড়া আর কেউই আহত হয়নি। তার পেছন দিকের শরীরে ছাল চামড়া উঠে গেছে ভীষণভাবে। আর সে প্রচণ্ডভাবে বেদনায় কাতরাচ্ছে।

বহু পরিশ্রম ও মাথা খাটানোর পর দুটি গাড়িকে ছাড়িয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত চেন দিয়ে গ্যারেজে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল।

আমরা শেষ অবধি মধ্যরাত্রের কিছু পূর্বে গিয়ে মন্দির এলাকায় পৌঁছলাম। যদিও যুক্তি দিয়ে এইসব দুর্ঘটনাগুলিকে কাকতালীয় বলে বা কুসংস্কার ভেবে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, তবু এরপর আমাদের দলের একটি প্রাণীও আর কাটারাগামা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা তামাশা করা কোন উক্তি করতে সাহস পায়নি।

দেবতাকে নিয়ে খেলা চলে না তা সে ধর্মেরই হোক না কেন।

দশজন ইয়া-জোয়ান শ্রমিক আর এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না সেই বিপুলায়তন ক্রুশটিকে। সাংঘাতিক ওজনের আখরোট কাঠের ক্রুশ।

সুদৃঢ় মাংসপেশী সমন্বিত শ্বেতশুভ্র মানুষগুলির দেহ বেয়ে কঠোর পরিশ্রমে দরদর বেগে ঘাম ঝরতে লাগল।

সারাটা দিনের অক্লান্ত প্রাণপণ চেষ্টায় তারা এই বৃহদায়তন কাষ্ঠ নির্মিত ক্রুশটিকে একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বয়ে নিয়ে উঠছিল।

ইতালী দেশের ক্ষুদ্র শহর কপার্তিনো এবং গ্রতেল্লার কনভেন্টের মধ্যে অবস্থিত এই ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় ক্রুশটিকে স্থাপন করা হবে এই ছিল নির্দেশ। সেটাকেই শ্রমিকেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওপরে।

কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হল না। আর তারা পারছে না। অসম্ভব ওজনের কাছে তারা বুঝি হার মেনে গেল। এখনো পাহাড়ের শীর্ষদেশ কমপক্ষে কুড়ি পঁচিশ গজ উর্ধে অবস্থিত।

বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছে। অনন্যোপায় হয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রমিকেরা একটা সমতল স্থান দেখে বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে লাগলো।

নিজেদের অক্ষমতা ও হতাশায় নিমজ্জিত ছিল বলেই ওরা বুঝি কেউ লক্ষ্য করেনি কখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন একজন নজরে পড়বার মত দীর্ঘকায় মানুষ; পরণে তার শ্বেতশুভ্র যাজকের পোশাক।

অবিশ্বাস্য দ্রুত পদক্ষেপে খাড়াই পাহাড়ে পথ তিনি উঠে এসেছেন শহর থেকে আসা রাস্তা ধরে।

সসম্ভ্রমে শ্রমিকেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলো।

—কি ব্যাপার বৎসগণ, তোমরা এখানে কি করছ? সস্নেহ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন আগন্তুক যাজক।

শ্রমক্লান্ত দশজন শ্রমিক সবিনয়ে নিবেদন করল যে এই বিরাট ক্রুশটাকে পাহাড়ের শীর্ষদেশে স্থাপন করবার আদেশ হয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা শেষ কয়েক গজ এই বিষম ওজনের ক্রুশটাকে বহন করে নিয়ে ওঠা তাদের শক্তির পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পথ এত খাড়াই আর জিনিষটা এত ভারী—বিষম বিপদে পড়েছে তারা।

সবকিছু শুনে যাজক সন্ন্যাসী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

অতঃপর সহসা গায়ের ক্লোক অর্থাৎ যাজকের ঢিলে পোষাক খুলে ফেলে শ্রমিকদের হাতের ইশারায় একপাশে সরে যেতে বললেন।

—আমি এসে পড়েছি। তোমাদের আর ভয় নেই।

এ কথা বলে যাজক মহাশয় দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মাটিতে রাখা ক্রুশটির কাছে।

দুটি হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মুখ হল আকাশ পানে নিবদ্ধ। চোখ দুটি বুজে এল তাঁর। মনে হল তিনি যেন গভীর প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

দু-তিন মুহূর্ত বাদেই সহসা সেই দশজন শ্রমক্লান্ত ইয়া জোয়ান শ্রমিক ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো। তাদের চোখগুলো অসম্ভব রকম বিস্ফারিত হয়ে গেল অলৌকিক কাণ্ড দেখে।

তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো সন্ন্যাসী যাজকের দীর্ঘকায় দেহ সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল।

পাখীর মত অনায়াসে তিনি শূন্যে ভেসে গেলেন। কয়েক ফিট

উপরে উঠে, উপুড় হয়ে দু হাত দিয়ে মাটিতে রাখা বিপুলায়তন আখরোট কাঠের ক্রুশটিকে ধরলেন। অতঃপর এক ঝটকায় সেটাকে তুলে ফেললেন। মাত্র কয়েক পাউণ্ডের একটা জিনিষের মত সেই নিদারুণ ভারী বস্তুটিকে অনায়াসে শূন্যে তুলে, দশজন ইয়া জোয়ান, হতবাক, বিস্ফারিত চক্ষু শ্রমিকের মাথার উপর দিয়ে কুড়ি পঁচিশ গজ উর্ধে পাহাড়ে শীর্ষদেশে নিয়ে গেলেন সেটাকে।

তারপর ক্রুশটিকে বসাবার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নে খনন করা এক গর্তে সেটাকে নিপুণভাবে স্থাপন করে দিলেন।

অবশেষে, শূন্য থেকে পুনরায় তিনি যখন নেমে এসে ভূমি স্পর্শ করলেন, ততক্ষণে বিস্মিত বিমূঢ় শ্রমিকেরা পড়িমরি করে ছুটে পাহাড়ের উতরাই পথ বেয়ে নেমে শহরে এসে উপস্থিত হল।

পরক্ষণে দেখা গেল শহরের রাস্তায় তারা চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটেছে: "যাজক জোসেফ আরেকটি মিরাকল করলেন, আবার শূন্যে ভাসলেন।"

শহরের মানুষজন সঙ্গে সঙ্গে নিজ ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের মাথার দিকে তাকালেন। দেখলো পাহাড় শীর্ষে স্থাপিত সেই বিশালকায় ক্রুশের পাদদেশে হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তিভরে প্রার্থনা করছেন সেই মহাধার্মিকপ্রবর সন্ন্যাসী-জোসেফ।

সেণ্ট জোসেফ!

কপার্তিনো শহরের সেণ্ট জোসেফের কথাই বলা হল এতক্ষণ।

এই পরমাশ্চর্য রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সপ্তদশ শতাব্দীতে সারা ইয়োরোপে তাঁর অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়া কলাপের দ্বারা সাংঘাতিক আলোড়ন তুলেছিলেন।

এই মানুষটিকে বলা হত "ফ্লাইং মঙ্ক" অর্থাৎ উড়ন্ত সন্ন্যাসী।

এক আধবার নয়, শত শতবার তিনি এই ধরনের অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন তখনকার মানুষজনকে।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-নির্ভর মানুষ আজ তিন শতাব্দী পরেও উক্ত অলৌকিক রহস্যের কোন সমাধানই খুঁজে পায়নি।

এ এক অপার রহস্যময় ঘটনা। অনুদ্‌ঘাটিত ঘটনা। অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত।

আজও ওদেশের গবেষকগণ বিস্মিতচিত্তে ভাবেন কি করে সেণ্ট জোসেফ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবকে বার বার অগ্রাহ্য করে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এর পেছনে কোন যাদুবিদ্যা বা সম্মোহনী শক্তি ছিল না। ছিল না কোন ছল চাতুরী বা প্রবঞ্চনা।

এক অদ্ভুত এবং অজ্ঞাত শক্তি বলে উক্ত সন্ন্যাসী যে শুধু শূন্যে উঠতে পারতেন তাই নয়, ইচ্ছেমত যত্রতত্র যে কোনভাবে দূরদূরান্ত স্থান পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে সমর্থ ছিলেন তিনি।

এই অতি আধুনিক বিংশতাব্দীর গবেষকগণ আজ অবাক হয়ে ভাবেন, তাহলে কি সেণ্ট জোসেফ উড্ডয়ন শিক্ষার আদি-পুরুষ? রাইট ব্রাদার্সদেরও পূর্বসুরী?

আজও যদি কেউ ইতালীর সেই ছোট্ট শহর কপার্তিনোতে যায়, তাহলে সে সেখানে এই সন্ন্যাসীর কীর্তিকলাপের বহুবিধ মনোরম ও বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাবে।

দেখতে পাবে ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তৈরী সেণ্ট জিউসেপ্পি (ইংরেজী উচ্চারণে জোসেফ) গীর্জা।

সন্নিকটবর্তী দোকানে দোকানে কিনতে পাবে ছোট ছোট পুতুল। সেসব পুতুলের গায়ে যাজকের পোষাক। দুই কাঁধে তাদের ডানা। কিংবা আঁকা সব ছবি, যাতে দেখা যাবে এক

সন্ন্যাসী বাড়িঘর গাছপালার ওপর দিয়ে পরীদের মত উড়ে চলেছেন।

সেন্ট জিউসেপ্পি বা জোসেফ।

পিতা ছিলেন একজন অতি দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রি। দেনার দায়ে, পাওনাদারের জ্বালায় একদা তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

পথে যেতে যেতে তাঁর স্ত্রী এক খামার বাড়িতে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন।

জিউসেপ্পি অতীব ভগ্নস্বাস্থ্য ও চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন।

সবসময় দেহাভ্যন্তরের একটি ফোঁড়ার ব্যথায় মাসের পর মাস শয্যাগত থাকতে বাধ্য হতেন তিনি।

ব্যথা বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন অবস্থা হল যে বালক জিউসেপ্পি আর কোন কিছুই মুখে তুলতে পারলো না। আহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

তখন তাঁর মা, ছেলের প্রাণসংশয় ভয়ে ভীত হয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ের জনৈক সেণ্টকে ডেকে পাঠালেন মুমূর্ষু সন্তানকে দেখাবার জন্য।

এই সন্ন্যাসী তন্ত্রমন্ত্র ঝাঁড়ফুঁকের দ্বারা নিরাময় করতে পারতেন বলে খ্যাতি ছিল।

সেণ্ট এলেন। এসে বালকের গায়ে হাত স্পর্শ করেই তিনি আর্ত চিৎকার করে উঠলেন: সর্বনাশ। এর দেহ তো মারা গেছে। শুধুমাত্র আত্মার অবস্থিতির জন্যই এখনো এ পৃথিবী ছেড়ে যায়নি।

পিতা এসে পুত্রের কপালে হাত দিলেন। বরফের মত ঠাণ্ডা কপাল। হাত পা শক্ত হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে না। চামড়া ভয়াবহ রকম ফ্যাকাশে এবং যথারীতি বাক রহিত হয়ে গেছে।

কিন্তু আচার্য, মরণের এতগুলো লক্ষণ যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বালকের চোখ দুটি রয়েছে সজীব। সে চোখ বাবা-মার পানে তাকাচ্ছে। আর ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে যেন সামান্য হাসির আভাসও দেখা যাচ্ছে।

বাঁচবে, বাঁচবে এ বালক, সহসা সন্ন্যাসী গুরু গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, ওর আত্মাকে স্বর্গ গ্রহণ করেনি, ফিরিয়ে দিয়েছে, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছে। শুনে রাখুন, এই ছেলে আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক কিছু বিস্ময়কর পথ দেখাবে এ পৃথিবীকে।

এই কথাগুলো বলে সেণ্ট বিদায় নিলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই বালক বিছানায় উঠে বসে খাবার খেতে চাইল।

সেই শৈশব থেকেই দেখা গেল জোসেফের ধর্মের দিকে মতি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিয়মিত হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে যেত।

এবং এ অবস্থায় প্রায় সময়ই মা দেখতেন ছেলের বাহ্যজ্ঞান নেই। অসার অচৈতন্য হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছে।

এইভাবে বছর বারো বয়সের মধ্যেই বালক পুরোপুরি তপস্বী হয়ে উঠলো। প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান এবং কঠোর উপবাস, খাদ্যে অনীহা। যাও খেত তা অতিব নগণ্য ও বিশ্রী স্বাদের। যাতে খাবার স্পৃহা কমে যায় সেজন্যে তেতো ও সুগন্ধযুক্ত এক-প্রকার পাউডার মিশিয়ে নিত খাদ্যবস্তুতে।

পোশাক অতি সাদাসিধে, কোমরে একটি শেকল আর সদাসর্বদা নগ্ন পা।

এ ছেলে যে সংসারী হবে না, তা বুঝতে মা-বাবার আর দ্বিতীয়বার ভাবতে হল না।

সন্ন্যাসী হয়ে গীর্জা বা মঠে ঢোকবার চেষ্টা প্রথমদিকে কয়েক-বারই বিফল হল।

জোসেফ দমবার পাত্র নন! ঐ পথই তো তাঁর নির্দেশিত পথ। চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

অবশেষে ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে ভাগ্যোদয় হল। তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করলেন সেথায়। জোসেফ পুরোপুরি সন্ন্যাসী হলেন।

এই সময়েই চারদিকে গুজব রটে গেল যে জোসেফের মধ্যে এমন সব আজব ও অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেগুলিকে আদৌ ঈশ্বরদত্ত বলে অভিহিত করা যায় না।

মঠ থেকে কর্তৃপক্ষ ওঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য পাঠালেন নেপল্‌সের হোলি অফিসে।

সেখানে তাঁরা ওকে নানাভাবে জিজ্ঞসাবাদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু পেলেন না।

পরে গীর্জার মধ্যেই ঘটল পরম বিস্ময়কর এক ঘটনা।

প্রার্থনা সভার মাঝখানে একদা দেখা গেল যীশুর মত দু-হাত দুদিকে বাড়িয়ে জোসেফ গীর্জার অভ্যন্তরেই শূন্যে উঠে, বিস্ময় বিমূঢ় হতবাক শত শত প্রার্থনারত মানুষের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে গিয়ে অলটার অর্থাৎ বেদী মঞ্চের অজস্র ফুল ও জলন্ত মোমবাতি সমূহের মধ্যে অবতরণ করলো।

উপস্থিত একজন সন্ন্যাসিনী এ আজব ও অকল্পনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মূর্চ্ছা গেলেন।

আরেকটি ব্যাপার দেখেও সবাই আশ্চর্যান্বিত হলেন। জলন্ত মোমবাতি সমূহের মধ্যে অবতরণ করা সত্বেও কিন্তু জোসেফের পোষাকে আশাকে আদৌ কোন আগুন লাগলো না।

সবাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এবার প্রবলভাবে সমবেত জয়ধ্বনী করে উঠলো।

এবার জোসেফ পুনরায় অলটার থেকে সেই হাঁটুগাড়া অবস্থায় শূন্যে উঠে গিয়ে ভাসতে ভাসতে গীর্জার একেবারে পেছনে চলে গেলেন।

পরম মুগ্ধ হয়ে নেপলসের হোলি অফিস ওঁকে স্বয়ং পোপ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানেই ঘটলো সেই আজব ঘটনা।

পোপ-এর হল ঘরে ঢোকবার মুখে জোসেফ আনন্দে এতটা উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে তৎক্ষণাৎ প্রার্থনার ভঙ্গীতে শূন্যে ভেসে উঠে তিনি সেই অবস্থায়ই প্রায় মিনিট খানেক ভেসে রইলেন।

স্বয়ং পোপও এ অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে দারুন মুগ্ধ হলেন।

এই শুরু। এরপর পরবর্তীকালে অসংখ্য বার বিভিন্নভাবে জোসেফ শূন্যে উঠে ভেসে ভেসে, রাখাল বালক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ, যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত রাজা-রাজড়া প্রভৃতি আপামর জনসাধারণকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করেছেন।

কখনো গীর্জা বা অট্টালিকাভ্যন্তরে, কখনো বাইরে, কখনো মাঠেময়দানে উদ্যানে, ভাব এলেই শূন্যে ভেসে উঠেছেন, স্থির থেকেছেন, ভেসে বেড়িয়েছেন।

ওঁর এই অলৌকিক শক্তি পরিদর্শন করে বহু অবিশ্বাসী নাস্তিক মানুষও শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত যা উড়েছেন বা শূন্যে ভেসেছেন তা একা একাই। এবার শুরু হল অপরাপর মানুষ নিয়ে ওড়া এবং ভেসে বেড়ানো।

সান্তা চিয়ারা গীর্জার একদা এক উৎসব চলাকালীন জোসেফ অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন এবং তন্মুহূর্তে ভেসে শূন্যে উঠতে থাকলেন। এ ব্যাপারের পূর্ব থেকেই তাঁর হাত ধরা ছিল জনৈক প্রিস্ট-এর।

তাঁকে সেই ধরা অবস্থায় শোলার হালকা পুতুলের মত নিয়ে জোসেফ শূন্যে উঠে ভেসে বেড়ালেন। হাত ধরা সেই প্রিস্ট তো

ভয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জোসেফ এক সময় তাকে মাটিতে পৌঁছে দিলেন।

এই প্রক্রিয়ায় জোসেফ একদা জনৈক অভিজাত বংশীয় পাগলকে সারিয়ে তোলেন। সেটাকে বলা যায় শক থেরাপী প্রক্রিয়া।

স্যার বল্ডাসার নামক জনৈক অভিজাত ব্যক্তির একদা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়।

তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে জোসেফের কাছে নিয়ে আসে নিরাময়ের উদ্দেশ্যে।

গীর্জায় এনে পাগল ভদ্রলোককে একটা চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়। কেননা অভিজাত পাগলটি ছিল হিংস্র উন্মাদ।

সে অবস্থায় থাকা উন্মাদের কাছে জোসেফ এলেন এবং তার মাথায় হাত রেখে কি যেন সব মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। পরে বললেন, এবারে ওর বাঁধন খুলে দিন।

আত্মীয়েরা ভীত এবং বিস্মিতও বটে। বলে কি! এ হিংস্র উন্মাদের বাঁধন খোলা মানেই সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

তবু সেণ্ট-এর আদেশ। আত্মীয়েরা ভয়ে ভয়ে পাগলের বন্ধন খুলে দিতে জোসেফ অকস্মাৎ এক প্রবল চিৎকার করে উঠে সেই উন্মাদ ভদ্রলোকের চুলের মুঠি ধরে নিমেষে তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠে গেলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে গীর্জার চতুর্দিকে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

পাক্কা পনের মিনিট বাদে যখন উভয়ে মাটিতে নেমে এলেন, ততক্ষণে সেই উন্মাদ রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছেন। শক থেরাপী কাজে লেগে গেছে।

এক সময় এগিয়ে এল সেই ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ।

এ বছরে সেণ্ট জোসেফ একদা রোগাক্রান্ত হলেন। দুর্বল দেহ ক্রমশ দুর্বলতম ও ক্ষীণকায় হতে লাগলো।

সেই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বুঝি তিনি শেষ অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করলেন।

ডাক্তার এবং পুরোহিতের বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে তিনি মৃত্যু-শয্যা থেকে এক সময় শূন্যে ভেসে উঠলেন।

অতঃপর ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেলেন মনাস্টারীর গীর্জার সিঁড়ির কাছে।

শূন্য থেকে অকস্মাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, পাহাড়ে চড়ছি। আঃ কি সুন্দর সঙ্গীত। আহা কী স্বর্গীয় সুমধুর ধ্বনী। আঃ কি সুন্দর মনোরম গন্ধ! কী মিষ্টি—এই তো স্বর্গের আস্বাদন।

অতঃপর জোসেফের ভাসমান দেহ ফের ফিরে এল তাঁর নিজস্ব সেল-এর বিছানায়।

দুপাশে তখন লাইনবন্দী দাঁড়িয়ে হতবাক শ্রদ্ধানত কত নরনারী? তাঁরা এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

পর দিবস সব শেষ হয়ে গেল।

এবার শুধুমাত্র আত্মাই উড়ে চলে গেল মহাশূন্যে—সেণ্ট জোসেফের অমর আত্মা।

শুধু মর-দেহটাই তার পড়ে রইল এ মর দুনিয়ায়।

ঘোড়ারা যার কথা শুনতো

এ দুনিয়ায় মাঝে মাঝে এমন এক একজন মানুষ জন্মায় যারা সঙ্গে করে নিয়ে আসে ঐশ্বরিক তথা অলৌকিক এক ক্ষমতা, যার সাহায্যে তারা এমন সব অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা করতে থাকে যাতে করে মানুষজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

সেই রকম অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন একজন লোকের কাহিনী আজ বলতে বসেছি।

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল।

রয়াল স্টেবল্‌ বা রাজকীয় আস্তাবলে কয়েকটি ঘোড়া এমন বেয়াড়া ও হিংস্র হয়ে উঠেছে যে তাদের নিয়ে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে। এক হয় ওগুলোকে আস্তাবল থেকে বিদায় করতে হবে, নয়তো এ দুনিয়া থেকেই খতম করে দিতে হবে গুলি করে।

পাকা পাকা ঘোটক-বিশারদরা যখন হিমসিম, এমন সময় সংবাদ এল লণ্ডনে এসে উপস্থিত হয়েছে সলোমন র‍্যারে নামক এক যুবক, যার বাড়ি আমেরিকায়।

সে নাকি দুনিয়ার তাবত বন্য ও বেয়াড়া, দামাল ও হিংস্র ঘোড়াদের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে পোষা বেড়ালের মত অনুগত করে ফেলতে পারে।

বলে কি।

হ্যাঁ তাই। তাহলে অবিলম্বে তাকে নিয়ে এস রয়াল স্টেবল-এ। তাই করা হল। মহারানীর নির্দেশে সে এসে গেল আস্তাবলে তার যাদুকর্ম দেখাতে।

স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া এসে উপস্থিত হয়েছেন আস্তাবলে। দেখি মার্কীন যুবক কি কেরামতি দেখায়।

ভি আই পি-তে ভি আই পি-তে ভরে গেল নগণ্য আস্তাবল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে তিনি বসে বসে দেখছেন।

এমন সময় সেই যুবকের আগমন।

লম্বা লেজওয়ালা কোট ও সাদা প্যাণ্ট আর মাথায় দীর্ঘ টুপি পরে এসে অভিবাদন করলো জন সলোমন র‍্যারে।

মহারানী উদগ্রীব হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

প্রথম যে ঘোড়াটাকে বশ করবার কথা, তার মত অতি হিংস্র এবং দুর্দমনীয় জীব আর দ্বিতীয় নেই রাজকীয় আস্তাবলে।

এ জানোয়ারটাকে পোষ মানাতে গিয়ে দুতিনজন বাঘা বাঘা ট্রেনার হতাশ হয়েছে, জখম হয়েছে ইতিপূর্বে।

এতটুকু ভুল হলে মৃত্যু অনিবার্য এই নির্মম উন্মাদ ঘোটকটির হাতে।

সার্কাসের মত দড়ি ঘেরা রিং করা হয়েছে দর্শকদের দেখবার সুবিধার জন্য।

এক সময় আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ির বাঁধন লাগিয়ে কয়েকজন ইয়া পালোয়ান সহিস ঘোড়াটাকে ঐ দড়িঘেরা রিং-এর দিকে নিয়ে আসছিল।

আরেব্বাস। ঘোড়ার কি সে ভয়ংকর রূপ! সামনের দু-পা তুলে মুহুর্মুহু লাফিয়ে উঠছে শূন্য পানে, কেশর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইছে। আর বিশালকায় লম্বা লম্বা দাঁত বের করে চিঁহি চিঁহি কানফাটা চিৎকার করে যাকে তাকে কামড়াতে চাইছে।

র‍্যারে প্রথমটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে ঘোড়াটার আগমন, আস্ফালন এবং চলন আচরণ লক্ষ্য করছিল।

সহসা র‍্যারে বলে ওঠে, এই, তোমরা ফের ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি।

বলে সে নিজেও সঙ্গে গেল এবং ঘোড়াটার সঙ্গে তার আস্তাবল কুঠরীতে প্রবেশ করে সহিসদের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে অনুরোধ করলো।

—আমি বললে তখন যেন দরজা খোলা হয়, তার আগে নয়, কেমন ? সহিসদের উদ্দেশ্য করে র‍্যারে বললো।

তাই হল। দরজা বাইরে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল। সবার দম বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল আতংকে। একটা যমসম জানোয়ারকে নিয়ে বিনা অস্ত্রে একটা প্রকোষ্ঠে ঢোকা এ যে অকল্পনীয় ব্যাপার, স্রেফ পাগলামি।

এক···ছুই···তিন···করে অসহনীয় দীর্ঘ মিনিট কাটতে লাগলো দর্শকদের চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে।

অতঃপর প্রায় ১৫।১৬ মিনিট বাদে বন্ধ দরজায় ভেতর থেকে আওয়াজ এল ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ত্রস্তে সহিসরা দরজা খুলে দিল।

আর আশ্চর্য বীরদর্পে বেরিয়ে এল র‍্যারে। বাঁ হাতে খড় দিয়ে পাকানো পলকা দড়ি ঘোড়াটার গলায় জড়িয়ে পোষা কুকুরের মত সেই দুর্দান্ত জানোয়ারটাকে ধরে জন সলোমন র‍্যারে নামক অদ্ভুত যুবকটি ঘরের বাইরে চলে এল।

তারপর সেই পনের কুড়ি মিনিট আগেকার হিংস্র ও উন্মাদ ঘোড়াটির পিঠে এক লাফে উঠে তাকে সেই দড়ি ঘেরা রিং-এর ভেতরে সার্কাসের খেলার মত পাক খেতে লাগলো।

সভা হল নিস্তব্ধ। বিস্ময়ে হতবাক। অলৌকিক ঘটনায় রোমাঞ্চিত।

পরবর্তী আরেকটি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘোড়াকে দিয়ে সে একই খেলার পুনরাবৃত্তি করলে। এবার সময় লাগলো মাত্র দশ মিনিট।

এরপর তৃতীয় এক কালো ঘোড়া।

এ জানোয়ারটিকে বলা যায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী।

কারণ ইতিপূর্বে সে দু দুজন ট্রেনারকে একদম খতম করে ফেলেছে।

স্থির ছিল এটাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

যথাপূর্বম এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোটক বিশারদ তাকে নিয়ে আস্তাবল প্রকোষ্ঠের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলো।

এক মিনিট···দু মিনিট···করে করে পাক্কা তিরিশ মিনিট কেটে গেল, অথচ র‍্যারে বেরিয়ে এল না।

সভা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভ্রূ কুঁচকে এল সবার। এবার ছোকরার নিজেরই খেল খতম হয়ে গেছে বুঝি।

আতঙ্কিত ও চিন্তিত মহারানী ভিক্টোরিয়া এবার দরজা ভাঙবার নির্দেশ দিলেন।

সহিসরা সশস্ত্র হয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভেঙে ফেললো।

ভেতরকার দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক ও চমৎকৃত হয়ে গেল।

দেখা গেল, খড়ের বিছানায় র‍্যারে এবং সেই অতি হিংস্র খুনে ঘোড়াটে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে।

এবং আরও আশ্চর্য, দুজনেই পরম নিশ্চিন্তেও স্বস্তিতে অঘোরে নাক ডাকিয়ে চলেছে।

র‍্যারে ঘোড়াটাকে পাশ বালিশের মত করে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।

উপস্থিত জনতার অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলো এই ভেবে যে, র‍্যারে নিশ্চয়ই কোন অষুধ-বিষুধ ব্যবহার করেছে।

কিন্তু সে সন্দেহও ভঞ্জন করলো যুবকটি সেই মুহূর্তে।

সে ঘোড়াটার কেশর ধরে একটি টান দিতেই তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো. ঘোড়াটি এবং অনুগত ভৃত্যের মত প্রভুর

আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে নতুন এই প্রভু র‍্যারেকে আদর করে চেটে দিতে লাগলো।

জন সলোমন র‍্যারের এই ঐশ্বরিক বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম প্রকাশ পায় যখন ওর মাত্র বারো বছর বয়েস।

র‍্যারের বাবা একবার কোথা থেকে একটা মহা পাগলা ঘোড়া কিনে আনলেন।

তাকে পোষ মানাতে গিয়ে হাত ভাঙলেন, পা ভাঙলেন।

আহত বাবাকে প্রতিবেশীরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে স্থির করলো যে এই পাগলা জন্তুটাকে গুলি করে মারবে। এসে দেখে সেটা দড়ি ছিঁড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

চতুর্দিকে রটে গেল একটা খুনী ঘোড়া পালিয়েছে। সাবধান, হুশিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসুদ্ধ লোকজন লাঠিসোটা বন্দুক নিয়ে দিক-বিদিকে ধাওয়া করলো।

অকস্মাৎ এক জঙ্গলের দিক থেকে কিশোর বালক র‍্যারের চিৎকার করে কাকুতি শোনা গেল, গুলি করবেন না, গুলি করবেন না। আমি—আমি ঘোড়াটাকে পোষ মানিয়েছি।

অ্যাঁ। সেকি। বলে কি পুঁচকে ছেলেটা।

এরপর অবাক বিস্ময়ে গ্রামবাসীরা দেখলো, সত্যি সত্যি তাই। বারো বছরের বালক র‍্যারে সেই বিপুলাকার হিংস্র জন্তুটির পিঠে চেপে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

যেন একটি পোষা ভেড়া নিয়ে রাখাল বালক আসছে।

দিকে দিকে এই আশ্চর্য সংবাদ ছড়িয়ে গেল। এবং এই প্রচারের ফলে দেশ দেশান্তর থেকে র‍্যারের ডাক আসতে লাগলো।

আর সেও পাকা ওঝার মত একের পর এক হাল ছেড়ে দেওয়া বুনো বদমাইস ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে যেতে লাগলো।

এসব করতে কোন ক্ষেত্রেই তার এক দেড় ঘণ্টার ওপর লাগলো না।

সকলেই অবাক। সকলেই উৎসুক। কি গোপন মন্ত্রে সে বশ করে এইসব পাগলা ঘোড়াদের ?

র‍্যারে শুধু মৃদু মৃদু হাসে। সঠিক জবাব দেয় না। শুধু তার গুপ্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে এইটুকুই ইঙ্গিত দেয় যে সে কেবলমাত্র সহৃদয় অর্থাৎ দয়ালু ব্যবহার এবং কয়েকটি অপ্রকাশ্য কথা বলে ঘোড়াদের বশে আনে। মানে, বোঝাতে চায় স্রেফ প্রেম ভালবাসা তার গুপ্তমন্ত্র।

উহুঁ। আরও কিছু আছে। আরো কিছু অলৌকিক। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নেই। প্রেম ভালবাসা সহৃদয়তা অনেকেরই আছে। কই তারা তো এ অকল্পনীয় কাজ পারে না।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার সামনে ইংলণ্ডে তার যাদু প্রদর্শনীর পরই র‍্যারের নাম সারা ইয়োরোপে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো।

ডাক আসতে লাগলো বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে।

লণ্ডনের পর প্যারিস।

সেখানে ফরাসী সম্রাটের সামনে এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করলো র‍্যারে।

তারপর একে একে কত দেশ। সুইডেন, প্রুশিয়া এবং জার-এর আমন্ত্রণে রাশিয়ার পিটস্‌বার্গ শহরে।

শত শত পাগলা ঘোড়াকে অজ্ঞাত মন্ত্রে বা অবোধ্য ক্ষমতায় বশ করে জন সলোমন র‍্যারে সে কালে দুনিয়া-বিখ্যাত হয়ে গেল।

আমেরিকা ফেরবার পথে সে পুনরায় ইংল্যাণ্ড যায়।

সেবার লর্ড ডরসেস্টার তাঁকে নিজের বিখ্যাত ঘোড়া ক্রুইজারকে উপঢৌকন হিসেবে ওকে প্রদান করেন।

এ ঘোড়াটির একটি ইতিহাস ছিল।

এককালে লাখ টাকা মূল্যের রেসের ঘোড়া ছিল ক্রুইজার।

সহসা কি যে হল। এমন মূল্যবান ঘোড়ার মাথা গেল খারাপ হয়ে। অকথ্য লাফানি কাঁপানি শুরু হল।

অহোরাত্র সে কি বিকট চিৎকার। আস্তাবলের দরজায় মাথা ঠুকে, লাথি ঝেড়ে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি করে তুললো।

একজনের হাত এমনভাবে কামড়ে দিল যে সে লোকটির হাত কেটে ফেলে দিতে হল।

এমন কি নিজের পা নিজে কামড়ে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে ফেলতে শুরু করলো।

দামী এবং নামী ঘোড়ার এক করুণ পরিণতি।

লর্ড ডরসেস্টারের এই এককালের আদরের প্রিয় ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতেও মায়া হল।

অবশেষে র‍্যারের আগমন।

শুনলে কেমন যেন লাগে, র‍্যারে এই বেহাল হয়ে যাওয়া ঘোড়াকে প্রায় বাজী রেখে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ভেড়ার মত পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিল।

লর্ড দেখে শুনে এমনই বিগলিত হয়ে গেলেন যে তিনি অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে ওকে এই নামী ঘোড়াটি দিয়ে দেন।

প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে র‍্যারে এক সময় স্বদেশ আমেরিকায় ফিরে আসে।

কিন্তু দুঃখের কথা মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে এই ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন যুবক অকালে দেহত্যাগ করে।

তবু মানুষ তার সুকর্মে বেঁচে থাকে। এই স্বল্পায়ু জীবনে সে যা করে গেছে তাতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ঘোড়া-প্রেমিকদের ইতিহাসে তা এক অবিনশ্বর কীর্তি বিশেষ।

সেই অলৌকিক ও অদ্ভুত কীর্তি বলেই মানুষের মনে জন সলোমন র‍্যারে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনচক্রের আজব কাহিনী

বিগত দিনের বহু অনুদঘাটিত রহস্যের সমাধান যদিও হয়ে গেছে আজকের বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার সৌজন্যে, তবু আজও একটি রহস্য তেমনি অনুদঘাটিত রয়ে গিয়েছে, যেমন ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী আগে।

আজও কারুর পক্ষে দাবি করা সম্ভব হয় নি যে তিনি 'নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনচক্রের রহস্যের' সূত্র বা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ নিয়ত গতিশক্তির গোপন রহস্য জেনে ফেলেছেন, এমন একজন আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর জন্য আজও মানুষ দিন গুনছে।

অথচ দু' শতাব্দী পূর্বে এই বিস্ময়কর রহস্য এক ব্যক্তির করায়ত্ত হয়েছিল। তিনি এই আজব যন্ত্র আবিষ্কার করে অবশেষে এক খেয়ালে তাকে ধ্বংসও করে ফেলেন। ফলে তিনি বিশ্বকে বঞ্চিত করেন একটি অকল্পনীয় উপকারী উদ্ভাবন থেকে, আজও বিজ্ঞানীরা যার সন্ধানে নিয়ত মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

যন্ত্রটি ধ্বংস হল সে যুগের মানুষের পক্ষে এত বড় বিস্ময়কর আবিষ্কারকে বুঝি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছিল, তাই। এ যে খোদকারী। ধর্মান্ধ মানুষেরা এর বিরোধীতা করেন পরোক্ষভাবে। আর ধ্বংস হল প্রতিভাধর আবিষ্কারকের হতাশা, সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রভৃতির জন্য। সেটাই বলা যায় মুখ্য কারণ।

এই আবিষ্কারকের নাম হল জোহান আর্নেস্ট বোসিয়ার। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্যাকসনীর অন্তর্গত জাটাউ নামক স্থানে এর জন্ম হয়। পনের বছর বয়স থেকে বেসিয়ার নিজের নাম পালটে "অরফাইরিয়াস" রাখে। এর কারণ অবশ্য অদ্যাপি অজ্ঞাত। এই বয়সেই সে থিওলজি, মেডিসিন ও প্রিন্টিং বিষয়ক রহস্য সন্ধানে মগ্ন

হয়ে যায়। কথিত আছে চব্বিশ বছর বয়সেই সে তদানীন্তন সহজ সরল মুদ্রণ শিল্পে আমূল পরিবর্তন এনে উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করে।

এইসব উদ্ভাবনের ফলে অরফাইরিয়াস মোটামুটি ধনশালী হয়ে উঠে, একটি বাড়ির এবং দু'জন গৃহভৃত্যের মালিক হয়ে যায়।

ছাব্বিশ বছর বয়সকালেই মানুষ কেমন যেন অন্তরমুখীন হয়ে সন্ন্যাসীভাবাপন্ন হয়ে যায়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে, পড়শীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বাক্যালাপ বন্ধ করে দেয়। শুধু মাত্র সে যুগের কয়েকজন অসাধারণ মেকানিক্যাল এক্সপার্ট ছাড়া আর কাউকে তার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে দিত না।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে বাইরে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো (বোধ করি তার দু'টি চাকরের মাধ্যমেই, যে অরফাইরিয়াস একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার করে ফেলেছে। শোনা গেল, সে এমন একটি চক্র তৈরি করেছে যা সাধারণ একটি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, এবং যা নিজে থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরতে সক্ষম।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সে নিজেই দাবি করলো, সে নাকি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার চক্র কোন প্রকার জ্বালানীশক্তি ব্যতিরেকেই নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনে সক্ষম। অর্থাৎ পারপিচুয়াল মোশন-এর গুপ্ত রহস্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে।

এখন সে সেই আজব যন্ত্রটি জনসাধারণকে দেখাতে প্রস্তুত।

সত্যি সত্যিই অরফাইরিয়াস তার কথামত যন্ত্রটির প্রদর্শনী করেছিল একদিন। হাজার হাজার মানুষ এসে, তাদের মধ্যে তদানীন্তন বাঘা বাঘা কারিগরী বিশেষজ্ঞও ছিল, সবাই এসে অবাক হয়ে দেখলো, তিন ফুট ব্যাসার্ধ ও চার ইঞ্চি চওড়া একটি চক্র অনবরত ঘূর্ণায়মান।

আরফাইরিয়াস তার দর্শকদের এও দেখালো এই অলৌকিক

যন্ত্র বহু পাইণ্ড ওজনের ভার উত্তোলনেও সক্ষম, যদি এর অ্যাক্সেলে দড়ি পাকিয়ে দেওয়া যায়।

অধিকাংশ দর্শকই দেখে-শুনে মুগ্ধ-বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু পরশ্রীকাতর মানুষ নানাভাবে একে বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তায় জর্জরিত করলো।

বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তার অসাধারণ যন্ত্রকে ঐ লোকগুলোর অসৌজন্যমূলক ব্যবহার আবিষ্কারককে ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত করে তুললো। এর মধ্যে অপরাপর ইঞ্জিনীয়ারদের কিছু দালালও ছদ্মবেশে এলো এ যন্ত্রের কলাকৌশল গোপনে জানতে যাতে কালক্রমে তারাই এ আবিষ্কারের বাহবা নিতে পারে।

ঐ সব নিন্দুকের কথাবার্তায় সে যেন ক্ষেপে গেল। তারা বিদ্রূপাত্মক খোঁচা মারা ভাষায় বলতে লাগলো যে, এ জিনিস বৃহৎ আকারে আদৌ সাফল্য লাভ করবে না। এ-সব কথায় যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো।

কোথায় ওকে প্রতিভাধর এক আবিষ্কারকরূপে প্রশংসা করবে, অভিনন্দন জানাবে, তা নয়, তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে কিছু দুষ্ট মতলববাজ লোক নানাভাবে হেয় করতে লাগলো, কি বাক্যে কি ব্যবহারে। রেগে-মেগে সে তার এই যন্ত্র-প্রদর্শনী আচমকা বন্ধ করে দিল।

এরপর তাকে দেখা যায় পরের বছর লিপজিগ শহরে। সঙ্গে নিয়েছে প্রথমটির চেয়ে আরও বড় চক্রওয়ালা নতুন এক যন্ত্র। এটার ব্যাসার্ধ পাঁচ ফুটেরও কিছু বেশী, আর প্রস্থে হল আট ইঞ্চি। এ যন্ত্র ৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত ভারোত্তলনে সক্ষম, আর এর সর্বোচ্চ গতি হল প্রতি মিনিটে ৫০ বার ঘূর্ণন।

কিন্তু এত বড় এই কৃতিত্বও অরফাইরিয়াসকে সাফল্য এনে দিতে

পারল না, বরং বলা যায় আরও বেশী হতাশায় নিমজ্জিত করলো। আগেকার শহর জেভাতে প্রদর্শনী কালে যে ভিড় হয়েছিল এ শহরে ভিড় হল তার চতুর্গুণ। কিন্তু নিন্দুকও জুটলো আরও বেশীসংখ্যক এবং নিন্দা ও বিদ্রূপাত্মক চোখ। চোখা অসহনীয় বাক্যও বর্ষিত হল শতগুণে বেশী। অবিশ্বাসীদের অবজ্ঞা বড় আঘাত দিল আবিষ্কারকের মনে।

একবার যখন তার যন্ত্র একটি ছোট ছেলেকে (৪৭ পাঃ ওজন) মাটি থেকে প্রায় ছয় ফুট উচ্চতায় তুলে ফেললো, কথার প্রশংসায় মুখর হবে তা নয়, তার প্রায় প্রাণ সংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল ছেলেটির মা বাবার হাতে। তাদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, এই ডাকিনী যন্ত্রের স্পর্শে তাদের সন্তানও শয়তান-স্পর্শ হয়ে গেছে।

বেচারা শিশুটিকে শোধন করবার উদ্দেশ্যে তাকে সিটি স্কোয়ারে উন্মুক্ত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে শত শত লোকের সামনে শত শত বালতি জল ঢালা হয় তার শরীরে। এইভাবেই তাকে ডাইনী বা শয়তানের প্রভাব মুক্ত করে শুদ্ধি করা হয়।

ফের ক্রোধে হতাশ হয়ে অরফাইরিয়াস গিয়ে উপস্থিত হল মারসিবুর্গ নামক স্থানে। এখানে সে নতুন করে তৃতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করলো, যার চক্রের ব্যাসার্ধ হল ছয় ফুট আর চওড়া হল বারো ইঞ্চি।

ইতিমধ্যে সে এ-সব ব্যাপারে চালাক হয়ে গেছে। পাবলিকের সামনে প্রদর্শনী করবার পূর্বে সে জ্ঞানী ও এক্সপার্ট মেকানিকদের এক কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিল। এইসব ব্যক্তিরা সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অতএব অরফাইরিয়াস ভাবলো, এদের কথা কারুর অবিশ্বাস হবে না।

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট কমিটি টেস্ট করা শুরু করলে এবং ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে দলের প্রত্যেকজন এক্সপার্ট-এর স্বাক্ষরযুক্ত অভিমত বের হল।

তাতে লেখা ছিল: "খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অরফাইরিয়াস সৃষ্ট চক্রটি নিঃসন্দেহে নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণনে সক্ষম। সামান্য ঠেলা দিয়েই চলা শুরু হয়। যখন পূর্ণ গতিসম্পন্ন হয়ে যায় তখন একে থামাতে দুজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শক্তির প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র আরও একটি শক্তির অধিকারী, তা হল নিজ ক্ষমতায় সত্তর পাউণ্ড ভার মাটি থেকে তিরিশ ফুট উচ্চতায় উত্তোলনে সক্ষম।"

এই অভিজ্ঞ অভিমতের কল্যাণে প্রচুর ভিড় হল সেই শহরে যন্ত্রটির প্রদর্শনীতে। কিন্তু হায়, সেই একই হতাশায় নিমজ্জিত করলো আবিষ্কারককে। এখানেও অবিশ্বাসী আক্রমণকারীর সংখ্যা যেন আরও বেড়ে গেল। এরা অবশ্য বিদ্রূপ করল না, কেননা, এক্সপার্টদের অভিমতে সে সুযোগ তাদের ছিল না। তারা নতুন কায়দায় আক্রমণ চালালো। তারা হ্যাণ্ডবিল ছাপলে, বিলি করলো জনে জনে। তাতে অভিযোগ করলো, এ যন্ত্রটি হল "ভয়াবহ ও দানবীয় উদ্ভাবন, যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে।" এবং তারা এর আবিষ্কারক হিসাবে অরফাইরিয়াস-এর "এইভাবে অজানা প্রকৃতির পবিত্ররাজ্যে অহেতুক নাক ঢোকাবার অপরাধে ওর কঠোর শাস্তি বিধানের" সুপারিশ করলো।

তিতিবিরক্ত হয়ে অরফাইরিয়াস মারসিবুর্গও ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু তাতেও তার উৎসাহে ভাটা পড়ল না। একজন প্রভাবশালী বন্ধুর সাহায্যে সে গিয়ে উপস্থিত হল হিজ সিরিণ হাইনেস দি গ্র্যাণ্ড ডিউক কার্লের কাছে, তাঁর হেসে ক্যাসেল দুর্গরাজ্যে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ওকে সাদরে গ্রহণ করলেন ওর গুণপনার কথা শুনে। তিনি ওকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে রাজী হলেন এবং ওকে নিজ দুর্গে একটি প্রকোষ্ঠে বসবাসের সুযোগও

দিলেন, যাতে এই আবিষ্কারক তার গবেষণা-কার্য আরও ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

অরফাইরিয়াস এতদূর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলো ডিউকের যে, ডিউক ওকে এক সময় খুবই লোভনীয় বেতনের পদ টাউন-কাউন্সিলার করে দিলেন।

এত সব সুবিধা ও অনুগ্রহের পরিবর্তে ডিউক এই শর্ত করলেন যে, অরফাইরিয়াস সৃষ্ট যন্ত্রের অভ্যন্তরের গোপন রহস্য তাঁকেও জানাতে হবে।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে অরফাইরিয়াস ঘোষণা করলো যে, তার চতুর্থতম যন্ত্রচক্রটি সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে গেছে।

এ সম্বন্ধে তদানীন্তন এক প্রফেসর গ্রেভস্যাণ্ডে একটি পত্রে স্যার আইজ্যাক নিউটনকে জানিয়েছিলেন :

"এটা একট ফাঁপা চক্র সম্ভবতঃ চৌদ্দ ইঞ্চি পুরু এবং প্রায় বারো ফিটের ব্যাসার্ধ। খুবই হালকা যন্ত্র, বহু টুকরো কাঠ জুড়ে জুড়ে ফ্রেমের আকারে গঠিত। এই সমস্তটাই একটা বড় চট দ্বারা নিখুঁতভাবে আবৃত, যাতে অভ্যন্তরভাগের কোন কিছু দৃষ্ট না হয়।

"ঠিক মাঝখান দিয়ে রয়েছে প্রায় ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের অ্যাক্সিস। এর দুই অন্তে এক ইঞ্চির চার ভাগের তিন ভাগ পরিমাণ অ্যাক্সেল। আমি খুব ভালভাবে কাছে থেকে পরীক্ষা করেছি এই যন্ত্র। এ বিষয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, বাইরেকার কোন শক্তি বা সাহায্য লাগানো হয় না এই চক্রটিকে ঘূর্ণনের ব্যাপারে।"

ডিউকের সম্মতিতে এই যন্ত্রটিকে প্রদর্শনীরূপে তিন মাসের জন্য রাখা হল। এ সময়ে যে কোন লোক প্রয়োজনে ইন্সপেকশন করতে পারবে। এই সময়ের মধ্যে বহু দেশের বহু বৈজ্ঞানিক ও ও ইঞ্জিনীয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এই অবিশ্বাস্য কলটিকে।

এইসব ব্যাপার-স্যাপার অবশ্য অরফাইরিয়াসের আদৌ ভাল লাগছিল না। সে কেবলই অভিযোগ করছিল এই বলে যে, তার এই যন্ত্র এর মধ্যে দিকে দিকে গৃহীত হয়ে তাকে আর্থিক সচ্ছল করে অবশ্যই তুলতো। তবে কেন এই গড়িমসি।

ফাইনাল টেস্ট শুরু হল ১৭১৭-এর ৩০শে অক্টোবর। ডিউক ওকে দুর্গের একটি বিশেষ ঘরে যন্ত্রটিকে স্থাপন করতে বললেন, এই ঘরে যাতে বেশ কিছুকালের জন্য চক্রটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকতে পারে।

ডিউক নিজে স্বহস্তে চক্রটিকে চালিয়ে দেবেন, সামনে থাকবে বহু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারবৃন্দ, পরে ঘরটি তালাবন্ধ করে দেওয়া হবে, সীল করে দেওয়া হবে। এই সীল যে কোন লোক পরীক্ষা করে দেখতে পারে। কয়েক সপ্তাহ বাদে নির্ধারিত এক দিবসে ছাড়া এ সীল ভাঙা যাবে না।

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী সীল খোলা হল ঘরের। আশ্চর্য, দেখা গেল সেই চক্রটি তখনো অবিরাম গতিতে ঘুরে চলেছে। ঘরে ধুলোয় ভরতি, এর দ্বারা প্রমাণ হল যে এ-ঘরে এই তিন মাস কেউ প্রবেশ করে নি।

সকলে তাজ্জব হয়ে গেল, মুগ্ধ হয়ে গেল, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল।

অরফাইরিয়াসের এর চেয়ে চরম সাফল্যের ক্ষণ আর ইতিপূর্বে জীবনে আসে নি। স্বয়ং গ্র্যাণ্ড ডিউক বিশেষ প্রীত হয়ে ওকে ওর যন্ত্র বিষয়ে রাজকীয় স্বীকৃতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং অকল্পনীয় আর্থিক সাহায্য, যা আজকের নিরিখে দশ লক্ষ ডলার, মঞ্জুর করেছেন যাতে ওর এই উদ্ভাবন কার্য দিকে দিকে স্বীকৃত হয়ে পাইকারী হারে প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয়। ঠিক এমনি সুখের সৌভাগ্যের সময়ই আবিষ্কারক এই

অরফাইরিয়াস বলা নেই কওয়া নেই হুম করে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল, হিংস্র উন্মাদ।

গ্র্যাণ্ড ডিউকের মঞ্জুরীকৃত বিবিধ কৃপার কথা তাকে জানানোর পূর্বেই অরফাইরিয়াস, যারা এককালে এর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বিদ্রূপাত্মক আক্রমণে, তাদের তেড়ে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করতে লাগলো। মারতেও গেল কাউকে কাউকে।

তারপর কোথা থেকে দৌড়ে এক কুড়ুল নিয়ে এল। অবশেষে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে গেল সেই প্রকোষ্ঠে, যেখানে ছিল তার অকল্পনীয় আবিষ্কারের যন্ত্রটি। বাধা দেবার সময় হল না। কুড়ুলের প্রচণ্ড আঘাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার ম্যাজিক উদ্ভাবন কতকগুলো কাঠের টুকরোয় পর্যবসিত হল।

খবর পেয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউক যখন সে প্রকোষ্ঠে ছুটে এলেন, তখন পাগলা অরফাইরিয়াস তার যন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের মাঝখান উপুড় হয়ে শুয়ে ডুকরে ডুকরে উচ্চঃস্বরে কেঁদে চলেছে।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় অরফাইরিয়াস মারা যায়।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেউই উক্ত জাদুযন্ত্রের রহস্য আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি। কাজে কাজেই কারুর দ্বারা ঐ ধরনের দ্বিতীয় কোন যন্ত্র তৈরি করাও হয়ে ওঠে নি।

গ্র্যাণ্ড ডিউককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন যে, মেশিনটির ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার এতই সহজ সরল যে ওটা দেখলে যে কোন ছুতোর বালকও নিমেষে বুঝতে পারত।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমেই বলবো যে, না অরফাইরিয়াস বা না ডিউক, দু'জনের কেউই ঐ যন্ত্রটির ভেতরকার কারিগরি বা কল-কবজার কোন নক্সা এঁকে রেখে যায় নি।

আজও পৃথিবীর যাবতীয় এক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার ও প্রতিভাধর বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে করে পারপিচুয়াল মোশন বা নিরবচ্ছিন্ন গতিসম্পন্ন কোন চক্রের রহস্যের গোপনতা উন্মোচিত করা যায়।

যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অকল্পনীয়। ছোটখাটো কিছু বস্তু নয়, একটা জলজ্যান্ত বিশালকায় জাহাজ কিনা অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে গেল এ পৃথিবী থেকে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বুদ্ধি দিয়ে এ ঘটনার কোন হদিশ মেলে না। অনুদ্‌ঘাটিত ঐতিহাসিক রহস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী এটি।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ।

'ওয়ারাটা' নামে ১৬৮০০ টনের একটি আধা-যাত্রী-আধা মালবাহী জাহাজ তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। গ্লেতের এক কারখানা থেকে। আধুনিক সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা তাতে যুক্ত করা হল। কেবলমাত্র বেতার যন্ত্র ছাড়া। তখন বেতার-যন্ত্র ব্যবহারের সবে শৈশব অবস্থা। সবাই এ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও বোঝেনি তখনও। পরীক্ষা-সফরটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল। জাহাজ কোম্পানির চল্লিশ বছরের ক্যাপ্টেন ইলবেরি খুশীই হলেন সে সফরে। সমুদ্র-ভ্রমণোপযোগিতার কোন কিছু ত্রুটি নেই 'ওয়ারাটা' জাহাজটিতে।

ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া, আবার ফিরে যাওয়া ইংল্যাণ্ডে—এই হল গতিপথ জাহাজটির।

অর্ধেক পথ, অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছল 'ওয়ারাটা'। তারপর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই এডেলেড বন্দর থেকে দিন তিনেক সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেই সর্বপ্রথম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হল। সমুদ্রে উঠেছে প্রবল বাতাস, উত্তাল ঢেউয়ে চরাচর ব্যাপ্ত। উথাল-পাথাল সমুদ্রের বুক চিরে বড় বেশী দোলা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে 'ওয়ারাটা' জাহাজ। বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে সে ৯২ জন

যাত্রী। আফ্রিকা ঘুরে ভারবান হয়ে তাকে ফিরতে হবে দেশে। যাত্রীরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে না এ তুফানে।

চতুর্থ দিনের বিকেলে জাহাজের সামনের ডেকে এসে দাঁড়ালেন এবস্‌ওয়ার্থ নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক অস্ট্রেলিয়ান সলিসিটর। এ ঝড়-তুফান তাঁকে নাড়া দিতে পারেনি। তিনি প্রথম যৌবনে বছর দশেক জাহাজে কাজ করেছেন। ক্ষেপা সমুদ্রে তিনি বিচলিত হন না। ঝাপটা-মারা নোনা বাতাস তাঁর ভালই লাগছিল।

নির্জন ডেকে আরেকটি মাত্র লোককে দেখা গেল। জীর্ণ একটা রেনকোট পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে নীচেকার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভয়াবহ রূপের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। এবস্‌ওয়ার্থ টলতে টলতে কাছে এগিয়ে গিয়ে চিনতে পারলেন শীর্ণকায় লোকটিকে। ইতিপূর্বে দু-একবার আলাপ হয়েছে এই ইংরেজ যুবকটির সঙ্গে। নাম ক্লড সওয়ার।

সলিসিটর ভাবলেন, ছেলেটি বুঝি সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তাই তিনি এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে তার মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করলেন।

সমুদ্র-বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করতেই ছেলেটি যেন কোমর বেঁধে জিজ্ঞাসার বান ডাকিয়ে দিলে। বোঝা গেল, ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে সমুদ্র-পীড়ায় নয়—তিন দিন তিন রাত্রি ধরে অপর একটি আতঙ্ক ওকে তাড়া করে ফিরেছে।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন 'ওয়ারাটা' কি রকম সাংঘাতিক-ভাবে দুলছে? প্রতিটি ঢেউয়ের আঘাতে পায়ের তলায় ডেক কি রকম নড়বড় করে উঠছে? এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা আপনি মনে করেন? এতবড় একটা জাহাজের কি আরও বেশী ধীর স্থির অচঞ্চলভাবে চলা উচিত ছিল না?

প্রথমটা এবস্‌ওয়ার্থ তরুণটিকে তার অযথা ভয় থেকে নিরসনের

চেষ্টা করলেন। প্রতি জাহাজেই এ ধরনের নার্ভাস দু-একজন যাত্রী থাকে, যারা অহরহ কেবল ভয়ে মরে, কিন্তু তরুণটির কথা শুনে সলিসিটরের সর্বপ্রথম মনে হল যে, সত্যিই তো জাহাজটা অস্বাভাবিকভাবে দুলছে।

আপনার কি মনে হয় না এতবড় একটা নতুন জাহাজের পক্ষে এই সামান্য ঝড়ে এতটা বেসামাল হওয়া উচিত ছিল না? সওয়ার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে।

ঠিকই। ঝড়টা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

যথার্থই তাই, একে ঝড় বলে না। দেখুন—দেখুন, এবারে ঢেউয়ের ওপরে উঠল জাহাজ। এই, এইবারে দেখুন কি রকম থরথর করে কাঁপছে। বলুন, কি রকম মনে হচ্ছে?

—হুম্। ঠিকই। এরকম দোলন সত্যিই যাচ্ছেতাই। সত্যি কথা বলতে কি, এতটা যে কাত হয়ে যাচ্ছে জাহাজ, এটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

সওয়ার এসে এরস্‌ওয়ার্থের একটি হাত ধরে বললে, আজ সকালে জাহাজটা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি অবধি বেঁকে হেলে যাচ্ছিল, বিশ্বাস করুন।

—ও নিয়ে চিন্তা করো না, সলিসিটর ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললেন, রেলিং ধরে নীচের দিকে চাইলে ও-রকম মনে হয়, বুঝলে? আসলে—

—না না। আমি রেলিংয়ের কাছে তখন আদৌ ছিলাম না। আমি নীচে স্নান করছিলাম। চৌবাচ্চায় জলের লেভেল দেখে বুঝেছি।

সলিরিটরের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে এল। তারপর জাহাজের সামনের দিকে চেয়ে বললেন, চল তো, উপরে গিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখে আসি। টাল খেতে খেতে প্রবল হাওয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে ওরা জাহাজের ওপরে এসে উপস্থিত হল।

সামনেটা অস্বস্তিকরভাবে একবার ঢেউয়ের ওপরে উঠে পুনরায় যখন নামছে, মনে হয় এই বুঝি ডেকে জল-ছুঁই ছুঁই হল। আর কি ঝাঁকানি ও কাঁপুনি, মোচার খোলাও বোধকরি এতটা টাল খায় না।

—হায় ভগবান, একটা ঢেউও যে কাটাতে পারছে না জাহাজ। সলিসিটরের মুখ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে উঠল।

সওয়ার ঠোঁট কামড়ে বিহ্বলভাবে একবার চারদিকে চাইল। উত্তাল সমুদ্র, অসহ্য দোলা, মাস্তুলের কাঁপুনি। ভয়াবহ!

—দেখুন, আমি গিয়ে এক্ষুনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ছেলেটি বলে।

—চল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

খবর পাঠাতে ক্যাপ্টেন জানালেন, সেলুনে রাত্রির আহারের পর তিনি ওদের সঙ্গে দেখা করবেন।

যথাকালে ওরা এসে সেলুনের ভেতরে এক কোণায় একটি টেবিল নিয়ে বসল।

ঘরটি প্রায় ফাঁকা। ওরা কফি ও বিস্কুটের অর্ডার দিল; অর্ধেক যাত্রীই নিজেদের কেবিনের বাঙ্কে শুয়ে চা ও টোস্ট দিয়ে রাত্রির আহার সেরেছে। দোলানিতে অনেকে মাথা তুলতে পারেনি।

অপেক্ষা করা অবস্থায় সওয়ার যেন আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল; কেমন যেন একটা অনিশ্চিত ভাব তার দেহ-মনে বাসা বেঁধেছে।

—ক্যাপ্টেন হয়তো ভাববেন আমরা পাগল। আসলে ক্যাপ্টেন এর কি করবেন?

সলিসিটর মাথা নাড়লেন, না না, অনেক কিছু তিনি করতে পারেন। জাহাজের মালগুলি চেক করে সুসমভাবে ছড়িয়ে রাখতে পারেন। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলি অদল-বদল করে ভার লাঘব করতে পারেন, গতিবেগ পরিবর্তন, গতিপথ পালটানো…ইত্যাদি ইত্যাদি

অনেক কিছু অদল-বদল করে এই উন্মত্ত দোলানি কমিয়ে ফেলতে পারেন।

অনৈকা প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এসে প্রবেশ করলেন সেলুনে। তাঁর গায়ের হীরা-মুক্তা-খচিত অলঙ্কার ও বহুমূল্য পোশাকেই বোঝা যায় তিনি অতীব ধনী ও অভিজাত মহিলা। নাম মিসেস জনসন। বোঝা গেল, এ-ধরনের আবহাওয়া ও সমুদ্র-ভ্রমণে তিনি অভ্যস্তা। মুখে প্রসন্ন শান্তির ভাব। সমুদ্র পীড়ার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

সরল, সহজ, স্বাভাবিক হাসিখুশী ভাব।

এগিয়ে এসে ওদের দিকে চেয়ে বললেন গুড ইভনিং। আশা করি, আমি এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম না।

এবস্‌ওয়ার্থ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, আসুন, মিসেস জনসন। আমরা আপনাব আগমনে বরং আনন্দিত। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

—ধন্যবাদ।

—পরিচয় করিয়ে দিই—এ যুবকটির নাম ক্লড সওয়ার।

—হাউ ডু ইউ ডু মিস্টার সওয়ার?

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম।

ভদ্রমহিলা তরুণটির সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে যেন কেমন নার্ভাস মনে হচ্ছে ইয়ংম্যান।

—অ্যাঁ···তাই বুঝি?···মানে,···থতমত খেয়ে সওয়ার আমতা আমতা করে।

এবস্‌ওয়ার্থই কথার উত্তর দিল, আমরা দুজনেই, বুঝলেন মিসেস জনসন, একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি। মানে···মানে, খুবই···

—মানে? ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—আমরা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

ব্যাপার হল—এই ছেলেটি এবং আমিও, মানে…ইয়ে…এই জাহাজের অহেতুক ও ভয়াবহ দোলানি দেখে একটু ভীত হয়ে উঠেছি।

সলিসিটর আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বলে গেলেন। মিসেস জনসন ধৈর্যসহকারে সব কিছু শুনলেন। তারপর তরুণটির পানে তাঁর মনোরম ভ্রূযুগল তুলে প্রশ্ন করলেন, সেকি! সত্যিই কি তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছ ?…

ছেলেটির কান দুটি আরক্তিম হয়ে উঠল। মাথা নীচু করে, বিচলিত কণ্ঠে বললে, হয়তো আপনি মনে করছেন কি গর্ধব আমি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ সমুদ্র-যাত্রার শুরু থেকে আমার কেমন যেন একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে। কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা, অশুভ ইঙ্গিত।

—এটা কি তোমার প্রথম সমুদ্র-ভ্রমণ ?

একটু ইতস্ততঃ করে সওয়ার মাথা নাড়ল।

—তবে কি দ্বিতীয়বার ?

—হ্যাঁ।

মিসেস জনসনের মুখে মিষ্টি হাসি দেখা দিল, আমি কিন্তু এতটুকু ভাবছি না। 'ওয়ারাটা' জাহাজ সম্পূর্ণ নতুন। জাহাজ কোম্পানি এত বোকা নয় যে, ত্রুটিপূর্ণ কোন জাহাজকে সমুদ্রে পাঠাবে।

সলিসিটরের মুখে কাষ্ঠহাসি দেখা দিল। সওয়ার মুখ নীচু করে কফিপাত্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বিন্দুমাত্র ভয়ের কারণ কোন দিক দিয়েই নেই, ভদ্রমহিলা বলে গেলেন, আমি অজস্রবার সমুদ্র-ভ্রমণ করেছি, এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী ঝড়ের মধ্যে দিয়েও আমি জাহাজে করে গিয়েছি। সয়ে যাবে, অভিজ্ঞতা হলেই সব ক্রমে ক্রমে সয়ে যাবে।

সলিসিটর কথার মোড় অন্য দিকে ফেরালেন। তক্ষুণি বিশালবপু ক্যাপ্টেন ইলবেরি এসে প্রবেশ করলেন সেলুনে।

প্রথমটা ওদের মধ্যে একথা-সেকথা হল। তারপর ক্যাপ্টেন বললেন, এবার বলুন কি ব্যাপার আপনাদের ?

ভদ্রমহিলাই বলে উঠলেন, এই ছেলেটির মনে এই সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে নাকি একটা অশুভ ইঙ্গিতের উদয় হয়েছে। কেমন, তাই না, ইয়ংম্যান ?

ছেলেটির মুখ ফের রক্তাভ হয়ে উঠল। কিন্তু এবার মুখ তুলে বললে, হ্যাঁ, স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

ক্যাপ্টেন বিরক্তিতে মুখবিকৃত করলেন।

আতঙ্কিত ?

যুবক তাঁর দিকে ফিরে বললে, বিশ্বাস করুন ক্যাপ্টেন। আমি অবশ্য সামান্য কিছু হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। কেন না জাহাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারেই স্বল্প। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে, 'ওয়ারাটা'র যে-রকম ভাবে চলা উচিত ছিল, মানে, আমাদের আশানুরূপ ভাবে সে চলছে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে জাহাজটার ওপর দিকটা ভীষণ ভার।

- এই কথা ? ক্যাপ্টেন নিজ চিবুকে হাত রেখে উত্তর দিলেন, তাহলে শুনুন, 'ওয়ারাটা' আমার পূর্বেকার জাহাজ 'গালং'-এর মত অতটা ধীর স্থির মজবুত নয় এ-কথা মানছি। অবশ্য দুটির ডিজাইনে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তবে স্থির অচঞ্চল হওয়া একটা বড় অদ্ভুত বস্তু। মানুষের হাঁটার মতই। এক-এক জনের এক-এক রকম। হুবহু একই নক্সার দুটি জাহাজের মধ্যেও কি এক অজ্ঞাত কারণে যথেষ্ট প্রভেদ হয়ে যায়। ঝড়ের মধ্যে একটি থাকে পাথরের মত অনড়, আর অপরটি হয় মোচার খোলার মত পলকা। অবশ্য এ-সব অভিজ্ঞতার কথা—ভ্রমণ করতে করতে এগুলো সয়ে যায়। তবে স্থিরনিশ্চয় জানুন—কোন ভয় নেই। দুশ্চিন্তা আপনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন।

—শুনে খুশি হলাম ক্যাপ্টেন, সওয়ার বললে, তবে এ দোলানি বন্ধ করবার যদি উপায় থাকে···মানে, মালপত্রগুলো···

—সে-সব ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যেই করেছি। সুতরাং শান্ত হোন, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, বিন্দুমাত্র কোন ভয়ের কারণ নেই। জাহাজটি পরিপূর্ণ সমুদ্র-ভ্রমণোপযোগী, চমৎকার শক্ত-সমর্থ জলযান।

ক্যাপ্টেন এরপর বিদায় নিলেন।

মিসেস জনসন বললেন, এবারে মনে শান্তি ফিরে এসেছে তো?

—মানে ··আমি···আমার যেন···

সলিসিটর স্বল্প হেসে বললেন, এ ব্যাপারের জন্য আমি আংশিক দায়ী। জাহাজ সম্বন্ধে আমারও মিস্টার সওয়ারের মত জ্ঞান।

বয় এসে টেবিল থেকে খালি কাপ-গেলাস তুলে নিতে লাগল।

সলিসিটর বললেন, ঠিকই, সত্যি কথা জানলে বলতে হয়, এটি একটি অতি নিরাপদ জাহাজ।

একটি গেলাস দোলানিতে টেবিল থেকে পড়ে ঝন্‌ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল। বয়টি কেমন যেন বিহ্বলভাবে সলিসিটরের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তার ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপছে।

—কি ব্যাপার বয়, কি হল?

—না স্যার···ক্ষমা করবেন স্যার···

—কিন্তু তুমি এরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বল, বল কি হয়েছে?

—তা আমি বলতে পারব না স্যার,···এই ভদ্রমহিলার সামনে।

মিসেস জনসন বিরক্তিতে নাক কুঁচকে বললেন, ননসেন্স। বলে ফ্যাল যা বলবার আছে।

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বয় বললে, এইমাত্র আপনি জাহাজটা সম্বন্ধে যা বলছিলেন স্যার—

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? সলিসিটর প্রশ্ন করেন।

—আমি যা জানি, তা যদি আপনি জানতেন, তাহলে কিন্তু এ ধারণা আপনার থাকত না।

—কি বলতে চাও তুমি?

উত্তেজনায় বয়-এর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এল।

—যতবারই এ জাহাজ ঢেউ-দোলা খায় ততবারই কড়ি বরগার ওপরে ডেকগুলি ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে চড়ে যায়। শুনলে অবাক হবেন যে, সমস্ত স্ক্রু-বল্টু, সব ভেঙে গেছে, বিশ্বাস করুন।

সওয়ারের চোখ ফের আতঙ্কে বিস্ফারিত হল, তাহলে ঐ প্রবল ঝাঁকুনি এই জন্যেই? সব স্ক্রু-বল্টু ভেঙে গেছে? এই জন্যই পাটাতনের নড়বড়ে ভাব?

—হ্যাঁ স্যার, তাই। কড়ি-বরগা ও পাটাতনের মধ্যে অনায়াসে আপনার হাত ঢুকে যাবে—এমন ফাঁক আর আলগা হয়ে গেছে।

অতঃপর সলিসিটরের দিকে ফিরে বললে, আপনি বলছিলেন না যে, বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ জাহাজ এটি। হুঁঃ—এটি একটি ভাসমান কফিন।

বাইরে উন্মত্ত সমুদ্র-বাতাসের গর্জন, বিশাল বিশাল ঢেউয়ের আছড়ানি, জাহাজের অকথ্য দোলা ও এই বয়ের কথা শুনে ভীত সওয়ারের অবস্থা যা হল, তা আর কহতব্য নয়।

এরপর আবহাওয়া ফিরল। জাহাজ ঝড় অঞ্চল পার হয়ে গেল। শান্ত মসৃণ সমুদ্র। দিন চারেক 'ওয়ারাটা' সুন্দরভাবে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল। ঘণ্টায় তেরো মাইল গতিতে শান্ত সমুদ্রে জাহাজটি চলতে লাগল।

এরপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

২৩।২৪শে জুলাই সওয়ারের কাছে এল এক ভয়াল রাত্রি।

নীচে কেবিনগুলি নিস্তব্ধ, একমাত্র ইঞ্জিনের কল-কল ও মৃদু কম্পন ছাড়া আর সমস্ত কিছু নিদ্রাভিভূত। আবছা আলোয় করিডোর আধা-অন্ধকার। রাত্রে স্টুয়ার্ড নিজ কেবিনে বসে একটি ম্যাগাজিন পড়ছে। সলিসিটর তাঁর নিজ ঘরে বসে আইনের কাগজ-পত্র অধ্যয়ন করছেন, একটি মামলার জন্যেই তাঁকে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যাণ্ড যেতে হচ্ছে।

সহসা রাত একটার কিছু পর একটা প্রচণ্ড আর্তচিৎকারে জাহাজের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। স্টুয়ার্ড ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে একলাফে বাইরে এল। চল্লিশ ফুট দূরে আরেকটি কেবিন থেকে সলিসিটর বিছানা ছেড়ে নেমে দ্রুত ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে করিডোরে এসে উপস্থিত হলেন।

অনকেই কেবিনের দরজা খুলে বাইরে এসেছে। মৃদু কল-গুঞ্জন সর্বত্র। উৎসুক বিহ্বল নেত্রে এ ওর পানে চাইতে লাগল। স্টুয়ার্ড ছোটাছুটি করে জানতে চাইল চিৎকারটি এল কোথা থেকে। একমাত্র সওয়ারের কেবিনই বন্ধ। স্টুয়ার্ড এসে দমাদম ধাক্কা মারতে লাগল তার দরজায়। কোন সাড়া নেই। বাধ্য হয়ে পকেট থেকে পাস্ কী দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। আলো জ্বালতে দেখা গেল সওয়ার কেবিনের এক কোণে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত কি যেন বক বক করে যাচ্ছে। চোখ দুটো আতঙ্কে অদ্ভুতভাবে বিস্ফারিত, সারা দেহ পাতার মত কাঁপছে। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, এমন কি কোন খুন-ছালের দাগ পর্যন্ত নয়।

—ছেড়ে যেতে হবেই—নেমে যাব অবশ্যই,···হা ঈশ্বর! আমরা সবাই ফাঁদে আটকেছি।···আমরা সবাই ডুবে যেতে বসেছি ···আমি বলছি আপনাদের···জাহাজের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে। অন্তিম অবস্থা···শেষ অবস্থা···অবধারিত।

নিজ মনেই বলে যাচ্ছে সওয়ার, কারুর কথা তার কানে যাচ্ছে না, কাউকে সে দেখছে বলেও বোধ হচ্ছে না। সাংঘাতিক শক্। ডাক্তার এল, সামান্য পরীক্ষা-অন্তে বললেন, শক্ পেয়েছেন ভদ্রলোক। বোধ করি ভয়ঙ্কর কোন অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন…।

পরদিন সকালে সিক-বেডে গিয়ে দেখা করলেন এবস্‌ওয়ার্থ তরুণটির সঙ্গে। প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে। তবে বড় ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—ও. কে.। এই তো আবার নরম্যাল দেখাচ্ছে। কি? কাল রাত্রে বোধ করি যাচ্ছেতাই এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে, তাই না?

—হ্যাঁ…হ্যাঁ, বোধহয় সেটা তাই··

—নিশ্চয়ই সেটা দুঃস্বপ্ন, ইয়ংম্যান। অবশ্য, আশ্চর্যের কিছু নেই। ক'দিন ধরেই তোমার নার্ভের যা অবস্থা চলছিল।

—কিন্তু আমি জীবনে খুব কমই স্বপ্ন দেখেছি। এটা—এটা এত স্পষ্ট, এত বাস্তব যে, একে…।

—বেশ তো, খুলেই বল না ঘটনাটা। বললে পরে বুকটাও খালি হবে, মনেও শান্তি পাবে।

—বলব? বেশ। সওয়ার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজল খানিকটা, তারপর কেমন অপার্থিব কণ্ঠে বলতে শুরু করলে, আমি…আমি একজন লোককে দেখলাম। সে কেবিনের বাইরে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দেহের চারিদিকে কি রকম একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি বের হচ্ছে। পোশাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত, আমার সম্পূর্ণ অজানা পোশাক। আর তার ডান হাতে…একটা তরোয়াল… বিরাট তরোয়াল। মনে হল, তরোয়ালটা যেন আমার দিকে উঁচু করে ধরে আছে সে লোকটি।

আবার চোখ বুজল ছেলেটি।

—তারপর? বল।

—আমি উঠে বসলাম, আলো জ্বালবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সুইচের কাছে যাবার আগেই লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এল। একেবারে আমার বিছানার পাশে। অন্য হাতে যেন তার কি একটা দেখলাম। একটা কম্বল…রক্তভেজা কম্বল!

—সে কি হে! তাই বুঝি ভয়ে তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে? অবশ্য ভয় পাবার মত ব্যাপারই।

—লোকটা কিন্তু নীরব ছিল। কি করে যেন আমার মনে হল সে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। সে হাত তুলল, আর আমার মনে হল কম্বল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত এসে আমার মুখে পড়ছে। বোধকরি তখনই আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

—ঠিকই, ঠিকই ইয়ংম্যান, সলিসিটর সহানুভূতিভরা কণ্ঠে সান্ত্বনার সুরে বললেন, তোমায় দোষ দিচ্ছি না, এ ধরনের ভয়াবহ কিছু দেখলে…

—দেখুন, আমি এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাব। সহসা উঠে বসে অস্বাভাবিক দৃঢ়কণ্ঠে সওয়ার বলে উঠল, আমি ডারবান বন্দর এলেই নেমে যাব।

—শোন, এক্ষুণি কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। কেন না, ক'দিন যা তোমার মনের অবস্থা গেল। দিন দুয়েকের মধ্যেই তুমি ঠিক হয়ে উঠবে, তখন নয়…।

—না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সওয়ার সলিসিটরের হাত ধরে বললে, আমি চাই আপনিও আমার সঙ্গে নেমে যান। আমরা ডারবান থেকে অনায়াসে অন্য জাহাজে উঠতে পারব।

—দুঃখিত। তা আমি পারব না। আমি একটা দিনও আর নষ্ট করতে পারি না। গুরুত্বপূর্ণ মামলার জন্য লণ্ডন যাচ্ছি—সেখানে আমাকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৌঁছতেই হবে।

—বোকার মত কাজ করবেন না। ডারবানই হল আমাদের শেষ সুযোগ। সওয়ারের কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপতে আরম্ভ করল, আমার কথা শুনুন। আমি জানি, নিশ্চিতরূপে জানি। এ জাহাজে থাকলে আপনি ইহজন্মে আর লণ্ডনের মুখ দেখতে পাবেন না।

সলিসিটর করুণার হাসি হাসলেন। ভাবটা, ছেলেটার মাথা ভয়ে একেবারে বিগড়ে গেছে। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, পারলে নিশ্চয়ই নামতাম ইয়ংম্যান। কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। এখন ভাল ছেলের মত বিশ্রাম নাও, আর সব আতঙ্ক মন থেকে মুছে ফেলে দাও। স্বপ্ন, সপ্নই। বুঝলে? স্বপ্ন কখনো বাস্তব হয় না। সহসা সওয়ার চুপ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে নিঃশব্দে হেসে উঠল সে।

—স্বপ্ন বাস্তব হয় না, না? আমি এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বাজি রাখতে পারতাম। কিন্তু…

—কিন্তু…কি? বল?

—বাজি রেখে লাভ কি হবে? কেন না, সে টাকা দেবার জন্যে তো আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না।…

ডারবান বন্দরে এসে 'ওয়ারাটা' জাহাজ যখন নোঙর করল, তখনও সওয়ার অসুস্থ। কিন্তু সে জিদ ধরল নেমে যাবেই, এবং অন্য জাহাজে করে দেশে ফিরবে। শেষবারের মত সলিসিটরকে নেমে যাবার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু সলিসিটর রাজী হলেন না কিছুতেই। বিদায় নেবার সময় সওয়ারকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

২৫শে জুলাই 'ওয়ারাটা' ডারবান ছেড়ে কেপ-টাউনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সওয়ার গিয়ে সারাটা দিন একটা হোটেলে বিশ্রাম নিল।

দুদিন বাদে সকালবেলা সে গিয়ে উপস্থিত হল 'ইউনিয়ন ক্যাসল লাইন' জাহাজ অফিসে।

ম্যানেজারকে গিয়ে বললে, আমি সমুদ্র-ভ্রমণে একটু নার্ভাস। আমি ইংল্যাণ্ডে যাবার একটি টিকিট কাটতে চাই। তবে যে জাহাজে যাব, সেটি যেন, মানে···মানে সুনামী···অর্থাৎ শক্ত-সমর্থ জাহাজ হয়।

ম্যানেজার মৃদু হাসলেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন স্যার। আমাদের সব জাহাজই শক্ত-সমর্থ পোক্ত, কোন বাজে জাহাজ আমাদের কোম্পানিতে নেই।

—ভাল। তাহলেও সে জাহাজটা সম্বন্ধে আমি পূর্বাহ্ণেই কিছু খবরাখবর জানতে চাই। আমি··সিডনী থেকে আসছি···একটা অতি বাজে জাহাজে করে আসতে হয়েছে।

বিস্মিত ম্যানেজার কৌশলে জেরা করে সওয়ারের কাছ থেকে পূর্বেকার সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিলেন। জানলেন 'ওয়ারাটা' জাহাজ সম্বন্ধে সওয়ারের অজানা আশঙ্কার কথা, সেটার নাকি অন্তিম অবস্থা, তাও শুনলেন। শুনলেন অদ্ভুত দুঃস্বপ্নে ভরা কেবিনের কাহিনীটি। মোহাচ্ছন্নের মত কণ্ঠে সমস্ত কিছু বিবৃত করল সওয়ার।

—'ওয়ারাটা'-র পক্ষে এটা শেষ সমুদ্রযাত্রা। সে বললে, ও জাহাজ আর কেপটাউনে পৌঁছবে না।

শুনে ম্যানেজার মনে মনে কেঁপে উঠলেন। কথাগুলো এমন দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন যে, শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, ঐ দুঃস্বপ্নটা আপনার পক্ষে একটা হুঁশিয়ারবাণী বিশেষ?

—নিশ্চয়ই। তাছাড়া গতরাত্রে···আমার হোটেলে···এর চেয়েও ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি 'ওয়ারাটা' বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বেসামাল হয়ে লড়াই করতে করতে চলেছে। সহসা বিশালকায় একটা ঢেউ

এসে তার সামনের দিকটা গ্রাস করল। জাহাজটা কাত হয়ে… নিমেষে জলের তলায় মিলিয়ে গেল।…

ম্যানেজার কেশে উঠলেন, ঘাড়ের কাছে একটা স্থান চুলকে নিয়ে কতগুলো ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দিলেন ওর দিকে।

—আশা করি এ দুশ্চিন্তা থেকে অবিলম্বেই আপনি মুক্তি পাবেন। আমি আপনাকে আমাদের সবচেয়ে সেরা, মানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এ ফর্মগুলো দয়া করে পূরণ করে দিন।

নীরবে কাগজগুলো নিয়ে সওয়ার কলম হাতে তা পূরণ করতে লাগল। তারপর সহসা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, আজকের তারিখ কত?

ম্যানেজার ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারের পানে তাকিয়ে বললেন, ২৭শে জুলাই স্যার।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই…

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে কিছু দূরে কোন এক স্থানে সমুদ্রের ওপর একটি ছোট স্টীমার বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে চলে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে একটি বড় জাহাজ একসময় এগিয়ে এল। সিগনালবাতিতে কথা চালাচালি হল।

—গুড মর্নিং। কোন জাহাজ এটা?

—'ওয়ারাটা', লণ্ডন যাচ্ছি।

—'ক্ল্যান ম্যাকইনটায়ার', আমরাও লণ্ডন যাচ্ছি। অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসতে কি রকম আবহাওয়া পেয়েছেন?

—প্রবল দক্ষিণ-পশ্চিমীয় বাতাস।

—ধন্যবাদ। 'ওয়ারাটা' বিদায়। যাত্রা শুভ হোক।

—ধন্যবাদ। তুমিও শুভেচ্ছা নাও। বিদায়।

বিদায়···যাত্রা শুভ হোক। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে চলছে উত্তাল গর্জন। দুটি জাহাজ একই পথে এগিয়ে চলেছে। অচিরে 'ওয়ারাটা' ছোট জাহাজটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। একসময় তার মাস্তুলটি দিকচক্ররেখার মধ্যে মিলিয়ে গেল। এবং সেই বোধ করি শেষ। তারপর ঐ জাহাজটি এ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। চিরদিনের মত। বিস্ময়কর ঘটনা। ইতিহাসে এমনটি আর ঘটেনি!

বিকেলের দিকে ঝড়ের বেগ সাংঘাতিক হয়ে উঠল। ক্রমান্বয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে চলল সে অঞ্চলের নিকৃষ্টতম সামুদ্রিক তুফান। তারপর যথারীতি সমুদ্র একসময় শান্ত শীতল হয়ে এল।

দিন কাটতে লাগল। 'ওয়ারাটা'র কেপটাউনে পৌঁছবার তারিখ কবে পেরিয়ে গেছে। অথচ জাহাজটার পাত্তা নেই। একই রাস্তায় অপরাপর শ্লথগতি ছোট জাহাজও ডারবান থেকে কেপটাউনে এসে পৌঁছে ফের রওনা হয়ে গেল। অথচ ওয়ারাটা'র দেখা নেই। পথে অপরাপর জাহাজ কোন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেনি। না কোন লাইফ বেল্ট, না কোন বিপদ-জ্ঞাপক ধ্বনি, জলে কোন ডেক-চেয়ার, কাঠের তক্তা বা নৌকো কিছুই দেখেনি তারা। কিংবা ডারবান থেকে কেপটাউনের মধ্যে তীরভূমিতেও কোন কিছু ভেসে আসেনি।

এইভাবে শুরু হল বিশ্বের বিশালতম সমুদ্র-তল্লাসী অভিযান। তিনটি যুদ্ধ-জাহাজ ও অঞ্চলটিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরল। অস্ট্রেলিয়া গভর্ণমেন্ট দ্রুতগামী 'সেভার্ণ' জাহাজকে পাঠাল নিজ খরচায়। সে জাহাজ এসে ও অঞ্চলের ২৭০০ মাইল পথ চুঁড়ে ফেলল, পাকা এক মাসের ওপর। ব্লু-অ্যাঙ্কর লাইন তাদের 'স্যাবাইন' নামক জাহাজ পাঠাল। সে জাহাজ ৮৮ দিন ধরে ১৪০০০ হাজার মাইল সমুদ্র চষে ফেললে—কিন্তু কেউই কোন

রহস্যের কিনারা করতে পারল না। জাহাজ কোথায় গেল? ডুবে গেলেও তার কিছু কিছু বস্তু অবধারিত সমুদ্রবক্ষে ভাসমান দেখা যেত। একটা কাঠের টুকরো পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এমনভাবে 'ওয়ারাটা' নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল যেন, মনে হল ও জাহাজ পৃথিবীতে কোনকালে ছিলই না।

এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজীর নেই। প্রায় ১৭০০০ হাজার টনের এক বিরাট জাহাজ, একশোর ওপর যাত্রী নিয়ে একেবারে চিহ্নহীনভাবে নিরুদ্দেশ হয় কি করে? বিভিন্ন আকৃতির ভাসমান বস্তুগুলি গেল কোথায়? যাত্রীদের একজনের মৃতদেহও কি ভেসে উঠবে না? বা কারুর চোখে পড়বে না?

বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ রহস্যে সারা বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে উঠল। পৃথিবীর সংবাদপত্রসমূহ নানা সিদ্ধান্ত-কাহিনী প্রচার করতে লাগল, কিন্তু কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জাহাজের নক্সা পরীক্ষা করা হল। কোন ত্রুটি নেই। যে-কোন সামুদ্রিক ঝড় সামলাতে সক্ষম সে। ছোট জাহাজেরা যে ঝড়-তুফান পেরিয়ে এল, তাতে অত বড় জাহাজের গায়ে আঁচড় লাগবার কথা নয়। তাহলে জাহাজ গেল কোথায়? কি করে মিলিয়ে গেল? কোথায় গেল?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ক্লড সওয়ারের অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীটি। তার স্বপ্ন, তার অজানা আশঙ্কা এভাবে বর্ণে বর্ণে ফলল কি করে? এ এক অজ্ঞাত রহস্য। অভিশপ্ত 'ওয়ারাটা' জাহাজের একমাত্র পরিত্রাণ পাওয়া যাত্রী সে।

এত বছর হয়ে গেল, আজও সেই নিরুদ্দিষ্ট জাহাজ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র বা কারণ আবিষ্কার করা যায়নি। কোন্ অলৌকিক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সওয়ারকে সাবধান করে দিয়েছিল? আর

কোন্ নিয়তিবলে একটা বিশালকায় জাহাজ এ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, এর সঠিক উত্তর আজও কোন মানুষ খুঁজে পাননি।

সমুদ্র-রহস্যের ইতিহাসে এ কাহিনীটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুদ্ঘাটিত এক ঘটনা।

সাপ চালানো ডাকিনী

ইংরেজ সাহেব প্রথমটা অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন নিদারুণভাবে যখন ঠেকে শিখলেন, প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

তাহলে এই ধরনের অলৌকিক ব্যাপারও সম্ভব? মরতে মরতে তিনি বেঁচে গেলেন একদা।

এ যে অভাবনীয়। আজ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতার পারমাণবিক যুগে শতাব্দী-প্রাচীন এ ধরনের মারণ-উচাটন বশীকরণ রোগ-নিরাময় প্রভৃতি ডাকিনী-বিদ্যায় কি করে বিশ্বাস করা যায়?

কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি?

আজও আফ্রিকার অধিকাংশ অধিবাসী এই ডাকিনী-ডাক্তারে (রোজা) বিশ্বাস করে থাকে। না, শুধু যে অশিক্ষিত অসভ্য জনসাধারণ তা নয়, শুনলে অবাক্ লাগে যে, স্বয়ং ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা পর্যন্ত এতে বিশ্বাসী। কেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী জমো কেনিয়াট্টাও প্রতিপদে এ সব মেনে চলেন। বড় বড় রাজা, সর্দার, প্রাদেশিক মন্ত্রী ইত্যাদি শিক্ষিত সমাজও কমবেশী সবাই ডাকিনী-বিদ্যা অনুশাসন মেনে চলেন।

ইংরেজ সাহেবের কথাটাই আগে বলি।

আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশের ডিটেকটিভ কর্মচারী এই সাহেব একদিন খবর পেলেন ডিনিওয়া মোসাম্বোয়া নামক ডাকিনী-বিদ্যার এক গুপ্ত-সমিতির কতকগুলি লোক গভীর অরণ্যসংকুল এক পর্বতের ওপর মিলিত হয়ে অতি সংগোপনে নানা ধরনের উদ্ভট ও ভয়াবহ আচার-অনুষ্ঠান শুরু করেছে।

সরকারী আইনে এসব নিষিদ্ধ। ওপর থেকে হুকুম এলো, এই দলের সংবাদ সংগ্রহ করে রিপোর্ট দাও।

সাহেব কাজে লেগে গেলেন। যথারীতি স্থানীয় অধিবাসী দুজন চরের সাহায্যে তিনি সংবাদ ও সভ্যদের নাম ইত্যাদি সংগ্রহে লেগে পড়লেন। চরদের একজনের নাম ইয়াকাবো, সে সরকারী দপ্তরের কর্মচারী। অপর ব্যক্তি হল দোকানদার, নাম সাবাস্তিয়ানি।

টুকটাক করে বেশ কাজ এগোচ্ছিল। কিন্তু এরপরই দেখা দিল এক ঝামেলা।

একদিন সকালে সাহেব সাবাস্তিয়ানির দোকানে গিয়ে দেখলেন দোকানটি বন্ধ। সামনে রাস্তার ওপর বসে আছে একজন অপরিচিত মানুষ। দরজার কড়া নাড়াতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন অপরিচিত লোকটিকে সাহেব প্রশ্ন করলেন, "সাবাস্তিয়ানি কোথায় বলতে পারো?"

—"তার অসুখ", উত্তর দিল লোকটা, "আমি তার ভাই। কী বলবার আছে বলুন।"

সাহেব মুহূর্তে সাবধান হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন সাবাস্তিয়ানির ভাই-বোন কেউ নেই—শুধু স্ত্রী আর শিশুসন্তান নিয়ে বাস করে সে।—তাই জিজ্ঞেস করলেন, "ওর স্ত্রী আছে?"

—"না, সেও অসুস্থ", উত্তর করে লোকটি।

স্পষ্ট বোঝা গেল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সাহেব সেখান থেকে সোজা সরকারী দপ্তরে গিয়ে ইয়াকাবোকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলেন। অফিসে কোনপ্রকার গোপন কথা বলা সম্ভব নয়। দেওয়ালেরও কান আছে। সমস্ত শুনে ভীতকণ্ঠে ইয়াকাবো বললে, "সাহেব, এ ব্যাপারে আর কোন সংবাদ নেবার চেষ্টা করবেন না। ডিনি-রা টের পেয়ে গেছে আমরা কি করছি। সাবাস্তিয়ানিকে ওরা শাসিয়েছে। ও তাই হাওয়া হয়ে গেছে।"

—"তাহলে ব্যাপার এই ? কিন্তু দোকানের সামনে ও লোকটা কে ? সে তো সাবাস্টিয়ানির ভাই নয়।"

কোন জবাব না দিয়ে ইয়াকাবো ত্রস্তে অফিসে ঢুকে গেল। সহসা সাহেব চেয়ে দেখেন অফিস ঘরের অপর একটি জানলা দিয়ে কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা অপর একজন আফ্রিকান ওঁদের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। ওঁদের কথাবার্তা সম্ভবত তার কানে গেছে। ইয়াকাবো তাই সরে গেল।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ইয়াকাবো সাহেবের বাংলোয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত তার মুখ-চোখ। সানুনয়ে সে বললে, "আমিও ভয়-দেখানো একখানা চিঠি পেয়েছি। যদি একাজ চালিয়ে যাই, সাংঘাতিক বিপদ আসবে আমাদের প্রত্যেকের ওপর।"

সে নাকি সংবাদ পেয়েছে, রাত্রি থেকেই সাবাস্টিয়ানি, তার স্ত্রী ও সন্তানকে পাওয়া যাচ্ছে না। যে লোকটা বসেছিল, সে ডিনি-সমিতির চর। ঈশ্বর জানেন সাবাস্টিয়ানির কী দশা হয়েছে! অফিসের জানলা দিয়ে চেয়ে-থাকা লোকটাও ডিনি-দলের গুপ্তচর, নাম ডাবানি। ও নিজেও নাকি ডাকিনী-বিদ্যা চর্চা করছে।

—"ও লোকটা একজন শিক্ষিত মানুষ, সে কিনা ওই সব জাদুবিদ্যায়···"

—"স্যার, কে যে নয়, বাইরে থেকে দেখে তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

সেদিনই সাহেব সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, গাড়ি থেকে নামতে যেতেই ফোঁস করে উঠল সেই বিষধর। ত্রস্তে পা গুটিয়ে না নিলেই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

পরদিন ঘটনাটার কথা ইয়াকাবোকে বলতে এক ফুঁয়ে যেন তার মুখের জ্যোতি নিভে গেল, ভয়াবহ আতঙ্কে সারা শরীর কেঁপে

উঠল তার। কি যেন বিড়বিড় করে ভয়ার্ত কণ্ঠে ডিনি-সমিতি সম্বন্ধে উচ্চারণ করলে। তারপর চলে গেল, যেন প্রাণহীন একটা মানুষের মত পা ফেলে।

পরের সন্ধ্যায় সাহেব জেলা হেডকোয়ার্টারে এক ডিনার-পার্টিতে গেলেন। শ্বেতাঙ্গ কমিশনার ওঁকে ডেকে নিয়ে গোপনে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বললেন, "ডিনি-সমিতি নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। শুনলাম ওদের নাকি বড় একটা মিটিং হয়ে গেছে, তাতে বলা হয়েছে একজন ইওরোপীয়ানের সমূহ বিপদ আসছে। অবশ্য আপনাকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে সে হলেন আপনি।"

দ্বিতীয় হুঁশিয়ারি। নিশ্চয়ই ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে শুরু হয়েছে নেপথ্যে। গভীর রাত্রে ডিনার থেকে ফেরবার মুখে কমিশনারের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলেন গাড়ি পর্যন্ত।

—"স্মরণ থাকে যেন কথাটা। ওই পাহাড়ের চূড়োয় কিছু একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র চলছে আপনার বিরুদ্ধে।"

বলতে বলতেই কমিশনার সাহেব ওঁকে আচমকা এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন এক পাশে, আর চিৎকার করে উঠলেন প্রবল কণ্ঠে, "সাবধান! লনের শেষে এক হাত দূরে ফোঁস করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণ বিষাক্ত একটি সাপ। ওকে গেবুন ভাইপার বলে। আরেকটুকু হলেই পা দিয়েছিলেন মৃত্যুমুখে।"

"এই একটি ইঙ্গিত", কমিশনার সাহেব কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু অবাক হচ্ছি, এ বাড়ির ধারে-কাছে কখনও আগে সাপ দেখিনি। এটা এলো কোত্থেকে?"

কিলবিল করে সাপটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরবার সময় কুড়ি মাইল পথ মোটর চালিয়ে আসতে আসতে সাহেবের মনটা এক অজানা আশঙ্কায় যেন ক্রমেই ভারী হয়ে এল।

কার কাছে কবে যেন তিনি শুনেছিলেন যে, এইসব ডাকিনী-বিদ্যাবিশারদরা অদ্ভুত মন্ত্রবলে সাপ চালনা করতে পারে। বিশ্বাস হয়নি এতকাল। কিন্তু আজ…।

সাহেব এরপর কাজে একটু ঢিলে দিলেন। কিছুদিন পরে খবর এল ওই পাহাড়ের ওপরে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠান হতে চলেছে। কেনিয়ার দিক্ থেকেও পাহাড় ডিঙিয়ে সব 'গুণী'জনেরা নাকি তাতে যোগদান করছে। আবার সাহেবকে চঞ্চল হয়ে উঠতে হল। সমস্ত কিছু ঘটনার খুঁটিনাটি সংবাদ নেওয়া জরুরী প্রয়োজন।

সাবাস্তিয়ানি অদৃশ্য। অতএব ইয়াকাবোই ভরসা। কিন্তু ইয়াকাবো সম্পূর্ণ বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে আর জীবন থাকতে কোন সাহায্য করতে রাজী নয়। এতটা অবাধ্য হতে ইয়াকাবোকে আর কখনও দেখা যায়নি। সাহেব তখন বললেন, "বেশ, তুমি যখন রাজী নও, আমি নিজেই চেষ্টা করে দেখি। সংবাদ আমাকে পেতেই হবে।"

—"সাহেব, শেষবারের মতো বলছি, আপনি ডিনি-সমিতির ব্যাপার ছেড়ে দিন। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দিন। নয়ত…নয়ত ভয়ংকর বিপদ হবে আপনার…"

তৃতীয় সাপের সঙ্গে দেখা হল একেবারে ঘরের মধ্যে, বিছানার ওপর। আরও বিষাক্ত জাতীয় সাপ : পাফ্ এডার।

সাহেব চিৎকার করে ভৃত্যকে ডাকলেন।

—"আরে বাপ্। এটা এখানে কি করে এলো?" চাকর চিৎকার করে ওঠে।

— "আগে মেরে ফেল, তারপর কথা।"

পাঙ্গা নামক অস্ত্রের এক আঘাতে শেষ হল সাপটি। ভৃত্যের মুখে শোনা গেল সাহেবের বাগানে আরও দুটো সাপ নাকি আজ মেরেছে সে।

শুনে সাহেবের শরীর প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এল। সাহেব আফ্রিকায় বহুকাল আছেন কিন্তু সবসুদ্ধ এযাবৎ কুড়ি একুশটার বেশী সাপের সাক্ষাৎ পাননি। অর্থাৎ বছরে এক আধটার বেশী নয়। কিন্তু এখন এক সপ্তাহের মধ্যে নিজে দেখেছেন স্বচক্ষে তিনটি আর চাকর দেখেছে দুটি—মোট পাঁচটি বিষধরের কাছাকাছি হতে হল।

ইয়াকাবোকে প্রশ্ন করলেন সাহেব, "তুমি কি বিশ্বাস করো যে, কোন মানুষের পক্ষে সাপ চালানো সম্ভব?"

—"হ্যাঁ সাহেব, করি। এ হচ্ছে ওই ডাবানির কাজ, সেই জানলা দিয়ে চেয়ে-থাকা কেরানী ডাবানি। সে শপথ করেছে, এমনভাবে আপনাকে হত্যা করবে যে, কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সর্পাঘাত করানোই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়। সুতরাং…"

একি বিশ্বাসযোগ্য কথা? বিংশ শতাব্দীতে এমন কি আফ্রিকাতেও যে এ ঘটনা কাল্পনিক মনে হয়। তাজ্জব লাগে।

সাহেব ভীষণ সতর্ক হয়ে গেলেন। অন্ধকারে চলেন না। হাত-পা ফেলবার সময় দেখে ফেলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সাপের পর সাপের সামনাসামনি হতে লাগলেন তিনি। এক ভারতীয় বন্ধু হরিলালের সঙ্গে একদিন তার কারখানায় গেলেন দেখা করতে। লন পেরিয়ে বাড়ীতে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে বেঁচে গেলেন। বিষ ছুঁড়ে-দেওয়া এক বিশাল গোখরোর কালান্তক ফণার সামনা-সামনি হলেন তিনি। হরিলাল সাহেবকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে, মারা যেতেন সেদিন সাহেব। ছুঁড়ে-দেওয়া বিষ নিশানাভ্রষ্ট হয়ে গেল।

এরপর পালাই পালাই রব উঠল। মাসখানেকের ছুটি নিয়ে ব্রিটেনে যাবার আগে আরও বার পাঁচেক সাপ তেড়ে এল সাহেবকে যেখানে সেখানে। একটা সাপ তো পা জড়িয়ে উঠেই পড়েছিল।

একবার দেখলেন একটা গাড়ির সীটে, আরেকটা অফিসের টেবিলের তলায়। ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি সামান্যর জন্যে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সমস্ত সাপই ভয়ানক বিষাক্ত। অথচ উগাণ্ডা প্রদেশে বিষাক্ত সাপের সংখ্যা অতি নগণ্য।

ডাকিনী বিদ্যা পারদর্শী মানুষের দ্বারা বুঝি সবই সম্ভব। কী অলৌকিক শক্তিবলে যে ওরা যমরূপী সরীসৃপদেরও বশে এনে চালনা করতে পারে তা ওরাই জানে। বিজ্ঞান-বিশ্বাসী সুসভ্য মন শুধু অবাক বিস্ময়ে দেখে তাজ্জব হয়ে যায়।

শুধু যে এরা ক্ষতি করে তা নয়, এদের অনেকে অদ্ভুত শক্তিধর মানুষও। জনৈক ইউরোপীয়ান ডাক্তার তাঁর এক বন্ধুকে জানিয়েছেন যে, কাম্পালায় একজন আফ্রিকান দোকানী আছে, সে এমনভাবে হাড় সেট করে দেয়, বিজ্ঞানে তার কোন হদিশ মেলে না। অলৌকিক শক্তিতে সে দুরারোগ্য ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে পারে। পরীক্ষা করে শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক বিস্মিত হয়ে গেছেন। ডাক্তারী-বিদ্যায় এর কোন সদুত্তর মেলে না। কী সব লতাপাতা, ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ ও বিড়বিড়-করা মন্ত্র; এই হল তার চিকিৎসা-পদ্ধতি। শ্বেতাঙ্গ ডাক্তাররাও কঠিন কেস-এ তার সাহায্য নেয়।

পুরুষদের চেয়ে মেয়ে-ডাইনীরা আরও সাংঘাতিক। নানারকম জড়ি-বুটি, নরকঙ্কাল এমন কি নরবলি দিয়ে এরা সব ওষুধ তৈরী করে। এদের কোপদৃষ্টিতে পড়লে সর্বনাশ হয়। এরা না করতে পারে এমন কুকর্ম নেই। সম্মোহনের দ্বারা মানুষকে নিজের কাজে লাগায়।

সম্প্রতি অবশ্য এই সব ডাকিনী-বিদ্যাবিশারদদের বীভৎস আচার-অনুষ্ঠান আইন করে বন্ধ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

টাঙ্গানাইকা হাইকোর্টে সেদিন এক মামলা উঠল। তিনজন ডাইনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর

অভিযোগ। সম্মোহন, বশীকরণ, বিষদান এমন কি ভয়াবহ নরহত্যা করেছে তারা।

আসামীদের একজনের বয়েস সত্তর, আরেকজনের বয়েস চল্লিশ, শেষের জনের বয়স বড়জোর বছর কুড়ি। বুড়ী ডাইনীর আপন ভাইঝি হল ছোট মেয়েটি।

জেরার মুখে মেয়েটি তার করুণ কাহিনী বলে গেল।

মেয়েটির সবে বিয়ে হয়েছে, এমন সময় তার পিসী বুড়ী ডাইনী তাকে বললে ডাকিনী-শিষ্যা হতে। শুধু তাই নয় তার স্বামীকে জীবন্ত হত্যা করে ডাকিনী ওষুধ তৈরি করবার জন্যে সাহায্য করতে আদেশ দিল।

মেয়েটি রাজী হয়নি। বুড়ী ডাইনী প্রচণ্ড ভয় দেখায়। মন্ত্রবলে বংশকে বংশ উজাড় করে ফেলবে এই বলে শাসায়।

বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে রাজী হতে হয়। প্রথমে তাকে ধীরে ধীরে উদ্ভট আচার-অনুষ্ঠান শেখাতে থাকে বুড়ী ডাইনী।

একদিন ওর অনুপস্থিতিতে বুড়ী ডাইনী গিয়ে ওর স্বামীকে কি যেন খাইয়ে দিয়ে আসে। সেই থেকে বেচারা প্রায় বোবা হয়ে যায়, আর পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা হাজার চেষ্টা করেও কোন রোগ নির্ণয় করতে পারেন না।

এরপর ঘটল এক ভয়ানক ঘটনা।

একদিন বুড়ী ডাইনী ভাইঝিকে নিয়ে গেল পাশের গ্রামে। সেখানে তিনটি গ্রামের ডাইনীরা মিলিত হয়েছে এক জঙ্গলের মধ্যে। গোপনে অনুষ্ঠান চলছে সেখানে।

নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। ভাইঝি সভয়ে দেখল সভার পাশে এক ঝোপের আড়ালে একটি অল্পবয়সী আফ্রিকান মেয়ে প্রায় অজ্ঞানের মত মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে

রয়েছে। জ্ঞান রয়েছে, অথচ নড়তে চড়তে পারছে না, চোখ মেলা রয়েছে, বোধ করি কিছু দেখতেও পাচ্ছে না।

তিনজন পুরুষ ডাইন খালি গায়ে লেংটি পরে, মাথায় পাগড়ি দিয়ে কি যেন মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রথমে খানিকটা নেচে নিল।

তারপর তাদের একজন গিয়ে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে সভার মাঝখানে শুইয়ে দিলে। একজন হাত দুটো চেপে ধরলো, আরেকজন দুটো পা। প্রথম ডাইন লোকটা বিশাল একটা ছুরি বের করে নিমেষে মেয়েটার মুণ্ড কেটে ফেলল আরেকজন কাটল হাত ও পা। তৃতীয় জন দেহটাকে সমান দুভাগে ভাগ করে ফেলল। এইভাবে সজ্ঞানে মেয়েটাকে বধ করা হল।

ওই গ্রামের ডাকিনীরা নিল হাত-পা ও দেহের অর্ধেক অংশ বুড়ী ডাইনী নিল নাড়ীভুঁড়ি ও দেহের অপর অংশ। সেই গ্রামের প্রধান ডাকিনীর পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হল মৃত মেয়েটির মুণ্ডটা। তারই জড়ি বুটিতে মেয়েটাকে নাকি আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

হাইকোর্টে উপস্থিত লোকেরা ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় কেঁপে উঠল এই বিবরণ শুনে।

ছোট ডাইনী মেয়েটি বলে গেল :

নিজ গাঁয়ে এসে প্রত্যেক ডাইনীকে এক এক টুকরো মাংস কেটে দেওয়া হল। সেই মাংস শুকিয়ে গুঁড়ো করে নাকি ডাকিনী ওষুধ তৈরি করা হবে।

এবার তার স্বামীর পালা। তাকেও ওইরকম বীভৎসভাবে কেটে টুকরো টুকরো করে ওষুধ তৈরি করা হবে, বললে বুড়ী ডাইনী।

ভাইঝি এবার ভয় পেয়ে গেল। সে ওই ভয়ংকর ঘটনা দেখে এসেছে সেদিন। ডাইনী শিষ্যা হলেও ভেবে সে শিউরে উঠল। স্বামীকে ওরা এভাবে হত্যা করবে। কি পৈশাচিক ব্যাপার। তার

স্বামীকে মূর্ছিত ও মোহাচ্ছন্ন করে দেবে বুড়ী ডাইনী। মেয়েটিকে তখন নিজ হাতে জীবন্ত স্বামীকে কাটতে হবে। নয়ত বুড়ী ডাইনীর অভিশাপে বংশ উজাড় হয়ে যাবে।

মেয়েটির সুমতির উদয় হল। সে গিয়ে শ্বশুরের কানে সব কথা তুলে দিল। শ্বশুর শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এসব কুসংস্কারে তার বিশ্বাস নেই। সে নিজে দলবল নিয়ে গিয়ে বুড়ীর সঙ্গে কয়েকটা ডাইনীকে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভীষণ ভাবে প্রহার করল।

তার ছেলে তখনও হাসপাতালে ধুঁকছে।

"আমার ছেলেকে ভাল করে দে। নয়ত জীবন্ত তোকে পুড়িয়ে মারব।" গর্জন করে ওঠে মেয়েটির শ্বশুর।

প্রথমটা কিছুতেই স্বীকার করে না বুড়ী ডাইনী। শেষে সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক মারতে, বুড়ী একটা পাতা দিল খেতে। সেটা খেয়ে ছেলেটা একটু ভাল হল বটে, কিন্তু দিন পনের বাদে সে মারা গেল।

আর রক্ষা নেই। টেনে নিয়ে গেল ওদের থানায়। সেখান থেকে আদালতে। কিন্তু শাস্তি তেমন কিছু হল না। কেননা নিহত মেয়েটার বাবা মা সাক্ষ্য তো দিলই না, বরং ডাকিনীদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

নরহত্যার অপরাধ প্রমাণ হল না। তবে অন্যান্য অভিযোগে বুড়ীর হল ছয় বছর জেল, দ্বিতীয়টার হল পাঁচ বছর, আর মেয়েটির তিন বছর।

আফ্রিকায় এখন নবজাগরণের ঢেউ লেগেছে—আফ্রিকাবাসীরা পুরনো সব সংস্কার আর কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নবজীবন লাভ করতে চায়।

তারই প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছে ডাকিনী-বিদ্যাচর্চা নিষিদ্ধ-করণের প্রচেষ্টায়।

অকল্পনীয় আকৃতি।

লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত ফুট। পদদ্বয় বিশেষ সবল। কোমর থেকে পায়ের দিকটা খাটো। উপরের অর্ধাঙ্গ সেই তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ। গলা ক্ষীণ কিন্তু মস্তকটি বিশাল। লোমহীন চেপ্টা মুখ, নাক দেখে মনে হয় তাতে বুঝি কোন হাড় নেই। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। চোখের তারা কাজল কালো এবং অতি চঞ্চল। অসীম শক্তিসম্পন্ন দীর্ঘ দুটি বাহু। পা থেকে মাথা অবধি তার ভল্লুকচমাবৃত। ১৬০০০ হাজার ফিট উচ্চতার এক শৃঙ্গ অধিত্যকায় সে বসেছিল। তুমুল তুফানের প্রলয়ংকর বেগে বইছিল হাওয়া। তার একটুকুও তাতে গ্রাহ্য নেই। যে টিলাটা ঠিক উপরে সে বসেছিল তার পেছন দিকে প্রায়-খাড়াই একটা পাহাড় [illegible] একটা গুহার মধ্যে ক্রমে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তীক্ষ্ণ নজরে চেয়েছিল সে নিচের দিকে। বহু নিচে কঠোর পরিশ্রমসহকারে সন্তর্পণে চারজন আধুনিক [illegible] লোক উঠে আসছে উপরে। প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ। বড় বড় আকারের পাতলা তুষার এসে তীরের মত আছড়ে পড়ছে দিগ্‌বিদিকে। তাতেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তার। হিমানীতে গড়া স্ট্যাচুর মত মানুষটি (হ্যাঁ সে মানুষই বটে) নিচের দিকে একাগ্র তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়েছিল পলকহীনভাবে। লম্বা এক দড়ির দ্বারা যুক্ত চারটি লোক ক্রমশ উপরে উঠে আসছে। পরনে তাদের ভারী তুষার-স্যুট, পায়ে পুরু সুইস-বুট। মাথায় বাঁদুরে টুপীর মত সারা মুখ আবৃত করা ফারের ক্যাপ। চোখ ঢাকা বক্রাকার কাঁচ দেওয়া গগলস্।

দলের অগ্রভাগের লোকটি এক বলিষ্ঠকায় পুরুষ। মাথা নিচু করে সাংঘাতিক পরিশ্রম সহকারে প্রতিটি পদক্ষেপে পেছনের তিনজনকে যুক্ত দড়িতে টানতে টানতে সে উপরে উঠে আসছিল। উঠতে উঠতে সহসা একসময় সে থেমে পড়ল। আচমকা টাল সামলে দাঁড়িয়ে গিয়ে দলনেতার দিকে চাইল পেছনের তিনজন লোক। দুহাত কপালের ওপর ঢাকা দিয়ে দলনেতা প্রবল তুষার-পাতের দিকে তাকাবার চেষ্টা করছিল।

নিচের দলটি দাঁড়িয়ে পড়তেই উপরের সেই দানবাকৃতি মানুষটি ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর অতি দ্রুত পেছনের চড়াই ভেঙ্গে (কখনো বা চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে) আরও ৮০০ ফিট উচ্চতায় এমন একটা ছোট্ট অধিত্যকায় উঠে এল যার ঠিক নিচেকার পথ ধরেই পর্বতারোহী দলটি ওপরে উঠে আসছে।

মানুষ চারজন নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছে। দলনেতা ওপর দিকে হাত দেখিয়ে কি যেন বলছে সঙ্গীদের। দলনেতা কিন্তু উপরে থাকা চমাবৃত মানুষটিকে আদৌ দেখেনি। বোধকরি কোন পথে উঠতে হবে তাই দেখাচ্ছিল সাথীদের। কিন্তু ঘটনাক্রমে, তার তোলা হাত নির্দেশিত হল সরাসরি সেই দৈত্যকারের দিকে।

সেই মুহূর্ত কাজে লেগে গেল দৈত্যমানব। একটা অসহনীয় তুফানের হলকা এল। মুহূর্তে সামলে নিয়ে আবার সে কাজে লেগে গেল। নিজের চেয়েও বিশালাকৃতি একটি আলগা শিলাখণ্ডকে সে তার দীর্ঘ বাহু দিয়ে অমানুষিক শক্তিকে স্থানচ্যুত করে ফেলল। তুষারের মূল থেকে সেটাকে যেন অবলীলাক্রমে উপড়ে নিয়ে এল। তারপর নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেটাকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঠেলে আনতে লাগল অকুস্থলের দিকে।

চারজনের দলটি ইতিমধ্যে পুনরায় পর্বতারোহণ শুরু করেছে।

তিলে তিলে খাড়া উপর দিকে উঠে আসছে তারা। ভল্লুকচর্মাবৃত দৈত্যটি উন্মত্তের মত এবার সেই বিপুলাকৃতি শিলাখণ্ডকে অকস্মাৎ ঠেলে দিল নিচের দিকে। প্রথমে চড়াৎ করে একটা শব্দ হল, তারপর বিকট আওয়াজে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে সেই তুষারিভূত প্রস্তরটি ঠোক্কর খেতে খেতে নেমে যেতে লাগল নিচের দিকে।

শব্দ শুনে দলটি যখন সচকিত হয়ে ওপরে মুখ তুলে তাকালো তখন আর সময় নেই। বিকট আতচিৎকারে দলনেতা পাশে সরে যাবার বৃথা চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে বৃহৎ শিলাখণ্ডটি এসে প্রচণ্ড বেগে তার দেহের ওপর পড়েছে। চোখের পলকে পাথরটির সঙ্গে সে নিচে গড়িয়ে গেল। যুক্ত দড়ির টানে সঙ্গী তিনজনও এক ঝটকায় তার অনুগামী হল। তুধারের কর্কশ বন্ধুর হাজার ফিট তুষার পথে হাড়গোড় আছড়াতে আছড়াতে তাদের চারজনের রক্তাপ্লুত দেহ পঞ্চাশ ফুট গভীর এক গিরিবর্ত্মে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উপরে দাঁড়িয়ে দৈত্যাকার মানবটি হিংস্র উল্লাসে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। অবশেষে নিচু হয়ে একটা কুঠার কুড়িয়ে নিল। পরক্ষণে চতুষ্পদ প্রাণীদের মত জান্তব দ্রুততায় চড়াই পথে উঠে গিয়ে প্রবেশ করল প্রান্তসীমার সেই গুহাভ্যন্তরে।

সেখানে ঢুকে কুঠারটাকে ছুড়ে ফেলে দিল এক পাশে। তারপর কতকগুলি পড়ে থাকা চামড়ার ওপর বসে পড়ল। গুহার দেয়ালের দিকে কিছুক্ষণ সে অর্থহীন চাউনিতে তাকিয়ে রইল। এক সময় মুখে দেখা দিল বিচিত্র হাসি। তার পবতরাজ্য থেকে হানাদার বিতাড়িত হয়েছে। পরমুহূর্তে মুখে দেখা দিল গভীর উদ্বিগ্নতা। সে জানে আবার আসবে আরেক দল, একের পর এক নতুন দল। অন্তহীন লড়াই করে যেতে হবে তাকে।

ভয়ানক ক্লান্তি এসেছে শরীরে। শুয়ে পড়ে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল সে।

বাইরে প্রলয়ংকর তুষারঝঞ্ঝার তাণ্ডব নৃত্য চলছে তখন।

বছরখানেক বাদে বসন্তকালে একদল শিকারি ঐ চারটি দেহকে আবিষ্কার করে। ১৪০০০ হাজার ফুট উচ্চতার চরম হিমে রক্তাক্ত দেহগুলি আদৌ নষ্ট হয়নি। তারা সেগুলোকে বয়ে নিয়ে এল বহু নিচেকার পাহাড়তলীর এক গ্রামে। তিন প্যাকেট কাগজ তখনও পাঠোদ্ধার করা যায়, বহু মাইল দূরের টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছে দিল রাণাররা। তার ক'দিন বাদেই এক কেবল্‌গ্রাম গেল লণ্ডনে। তাতে লেখা ব্রিটেনের চারটি বীর সন্তান বিশ্বের দুরারোহ এক পর্বতের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। দৈনিক পত্রিকায় শিরোনামা বের হল: বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট এভারেস্ট তার মৃতদেহগুলি ফেরত দিয়েছে।

উপরে বর্ণিত কাহিনীটি জনৈক সাংবাদিকের কল্পনাপ্রসূত। আসলে কি হয়েছিল সেদিন তা কেউ জানে না। কিভাবে এই চারজন দুঃসাহসীর মৃত্যু হল? পদস্খলন, পরে আতঙ্ক? না কি অনিবার্য ধস নামা? না কি অজ্ঞাত কোনো রোমাঞ্চকর কারণে নিহত হল?

কয়েক মাস বাদে নেপালের পোস্টাপিসের ছাপমারা এক পত্র গেল লণ্ডনে। তাতে একটি মাত্র শব্দ লেখা ছিল: তুষারমানব। পত্রের তারিখ ছিল ১৯৩৬-এর ৫ই জুন। তারপর ৪৩ বছর কেটে গেছে। এ রহস্যের কোন সমাধান আজও হয়নি। তুষারমানব কি প্রকৃতই আছে? না ওটা কিছু সংখ্যক লোকের কল্পনা মাত্র? এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। এমন কোন মানব বা মানবগোষ্ঠী আছে কি যারা দুনিয়ার তাবৎ সভ্য মানুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তুষারের দেশে বাস করছে? এটা কি সম্ভব যে অকল্পনীয় হিমের রাজ্যে যেখানে কোন লোমস প্রাণী যেতে সাহস পায় না, সেখানে বাস করছে শুধু চামড়া সম্বল

মানবদেহী একদল প্রাণী ? যদি থেকে থাকে তারই বা রহস্য কি ? ইদানিং এ-বিষয়ে আরও সব প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে। তবু তর্কের অবসান হয়নি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক এরিক সিপটন মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে বিফল হয়ে ফেরবার পথে এক অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেন। তিনি সেগুলির যে ফটোচিত্র নিয়ে আসেন তা দেখে বৈজ্ঞানিক জগৎ বিস্মিত হয়। সে ছবি হল দানবাকার পদচিহ্নের। মানুষের মত কোন প্রাণীর বিশাল পায়ের ছাপ। সিপটন সেগুলোকে তুষারমানবের পদচিহ্ন বলেই অভিহিত করেন। তাঁর ধারণা ঐ পদচিহ্নগুলি যার সে মানব জাতির এক সম্ভবত তুষারযুগের মানবই হবে।

অতঃপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডমণ্ড হিলারী ও তেনজিং নোরকে দুরারোহ এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন। এ সংবাদ বহন করে নিম্নে বর্ণিত অবতরণরত একটি শেরপাদল সহসা কতকগুলি 'তুসারমানবের' দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ঐ প্রাণীগুলি লোমশ ও দীর্ঘদেহী। প্রত্যেকেরই পায়ে খুব বড় আকারের বুড়ো আঙুল আছে, যার সাহায্যে তারা অনায়াসে বড় বড় খাদ লাফিয়ে পার হয়ে শেরপাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এর তিন বছর বাদে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর অপর এক অংশ থেকে আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ আসে। সে বছর ব্রিটিশ অলিম্পিক স্কি টিম, ভ্যাল-ডি ইসেরে থেকে অল্প দূরে ফরাসী আল্পসে একই ধরনের 'তুষারমানবের' পদচিহ্ন দেখতে পায়। সুদূর হিমালয়ের ছাপের সঙ্গে সে ছাপের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

দুনিয়াময় পুনরায় বৈজ্ঞানিক জল্পনা-কল্পনা প্রবল হয়ে উঠল, বহুকালব্যাপী একই প্রশ্ন সবার মনে উদয় হতে লাগল। এবং কালক্রমে এমন সব প্রমাণ আসতে লাগল, যার ফলে বহু লোকের

মনেই এ বিশ্বাস স্থাপিত হল যে, 'তুষারমানব' যে শুধু অতীতে ছিল তাই নয়, এখনও তারা সশরীরে বর্তমান।

দি অ্যাবোমিনেবল্ স্নোম্যান। এ নামটায়ও বহু পণ্ডিতের আপত্তি। যেন পূর্ব হিমালয় ও দক্ষিণ তিব্বতের তুষাররাজ্যে এমন একটি নিঃসঙ্গ একাকী দৈত্যকায় মানব বাস করে যার পিতা নেই মাতা নেই, নেই কোন সঙ্গীসাথী কিংবা পুত্রপরিবার। আর ঘৃণিত হতে যাবে সে কোন্ দুঃখে! সে অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-শাখার প্রাচীনতম বংশোদ্ভুত এক প্রাণী, সভ্যতার স্রোত এড়িয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আজও টিকে আছে। যাদের কোন ভাষা নেই, আগুনের ব্যবহার কাকে বলে তা জানে না। লোমশদেহী এই মানবসন্তানদের প্রতি 'ঘৃণিত' বিশেষণ যোগ করলে প্রকৃতই অন্যায় হয়। আর 'তুষারমানব' শব্দটাও হাস্যকররূপে অর্থহীন। এর অর্থ কি তুষারে গঠিত কোন মানুষ, না কি তুষারদেশে যারা বাস করে সেই মানুষ? প্রথমটি অবশ্যই নয়। আর দ্বিতীয়টি প্রাণীবিজ্ঞানে অসম্ভব কল্পনা। কারণ নিঃসীম তুষাররাজ্যে যেখানে এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেই স্থানে কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। স্যার এডমণ্ড হিলারী প্রভৃতি যার বা যাদের পদচিহ্ন দেখেছিলেন অবশ্যই সেই প্রাণী বা প্রাণীরা তুষার-রাজ্যের লাগোয়া কোন অরণ্যে বসবাস করে থাকে।

পাশ্চাত্যের জনৈক প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানীর মতে একে 'তুষারমানব' না বলে তুষারযুগের মানব বলাই উচিত। কারণ এই ধরনের প্রাগৈতিহাসিক মানবসন্তানের আরও সন্ধান পাওয়া গেছে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে, যুগের পর যুগ ধরে। এ বিশ্বের বহু স্থানই আজও মানুষের অনাবিষ্কৃত ও অগম্য রয়ে গেছে। সেসব জায়গার কোন মানচিত্র নেই, তেই সেখানে কোন সভ্য জনমানবের

বসতি। এর কিছু অংশ দুস্তর মরু, কিছু অনধ্যুষিত তুষারময় স্থান আর বাদবাকি দুর্গম গহন অরণ্য। এইসব স্থানে এখনও হয়ত বা সৃষ্টির প্রভাতকালীন যুগের মানবের কিছু শাখা প্রশাখাসম্বলিত বংশোদ্ভূত দল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তার প্রমাণও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

যেমন পাওয়া গিয়েছিল হিমালয় অভিযানকারী এরিক সিপটনের দ্বারা। তিনি, মাইকেল ওয়ার্ড ও শেরপা তেনজিংকে নিয়ে সেসময় গৌরীশঙ্কর আরোহণের চেষ্টা করছিলেন। ৮ই নভেম্বর তারিখে এক বিচিত্র পদচিহ্ন দেখলেন, যেটা বলা হল নেপালী ভাষায় মেহ টেহ্ নামক এক প্রাণীর। পদচিহ্নধারী অবশ্যই দুপায়ে হাঁটা জীব। প্রায় মাইলখানেক তুষারভূমির ওপর দিয়ে সে পদচিহ্ন গিয়ে এক গভীর খাদের পাশে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যে খাদ পার হওয়া আজকের মানুষের পক্ষে অতীব অসম্ভব। ফটো নেওয়া হল তার। তারপর সেগুলো দেখে ছাচ তৈরী করে লণ্ডনে প্রদর্শন করা হল। ভালুক বা বাঁদর জাতীয় কোন প্রাণীর পায়ের ছাপের সঙ্গেই তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। আর আশ্চর্য, পৃথিবীর অপরাপর অংশে প্রাপ্ত পদচিহ্নের সঙ্গে সেগুলির বিস্ময়কর মিল দেখা গেল।

কালিফোর্নিয়ার শহর ইউরেকা থেকে একশ মাইল দূরবর্তী এক অনাবাদি স্থানে বুলডজার দিয়ে বসতি-উপযোগী করে তোলবার সময় ড্রাইভাররা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল প্রতিদিন সকালে বুলডজারে চষা সমতল মাটির ওপর অদ্ভুত সব পদচিহ্ন পড়ছে। ড্রাইভার, কাঠুরে, রোড-ইঞ্জিনীয়র এবং সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা অবাক হয়ে দেখল, সে পায়ের ছাপ। এক একটি বাইশ ইঞ্চি লম্বা। চক্রাকারে প্রায় ৬০ ইঞ্চি পর পর পা ফেলে সেই অজ্ঞাত দুপেয়ে প্রাণী চতুর্দিকে হাঁটাহাঁটি করে একসময় গভীর বনের মধ্যে চলে

গেছে মনে হল। হুলুস্থুলু খোঁজখবর ও সন্ধান করে প্রাণীদের অবশ্য কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, তবে স্থানীয় অনেকের মুখে শোনা গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু লোক নাকি ঐসব অঞ্চলে এই ধরনের ছাপ মাঝে মাঝেই দেখে আসছে। শুধু ওখানেই নয়, নিম্নলিখিত দেশগুলিতে ও স্থানগুলিতে একই রকম অজ্ঞাত পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে: যথা, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, রাশিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, মালয়, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি আর ইয়োরোপের বহুদেশ এবং উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অধিবাসীদের নিকট থেকে এদের সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্ধান পাওয়া গেছে।

হিলারী শুধুমাত্র 'তুষারমানবের' সন্ধানেই প্রায় ৬০০ শত লোক নিয়ে পুনরায় হিমালয়ে যান এবং সেই জনহীন, খাদ্য ও ভাণ্ডদহীন চিরতুষার-অঞ্চলে বহু ঘোরাঘুরি করেও উক্ত প্রাণীর কোন পাত্তা পান না। তখন তার কাছে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়: এক হয় নিজের বিফলতাকে স্বীকার করা, না হয় তুষারমানব বলে কোন কিছু নেই তাই প্রমাণ করা। দ্বিতীয় পন্থাই বেছে নিলেন তিনি। স্থানীয় একটি প্রাচীন প্রাণীর করোটি ও জনৈক নেপালীকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে সেই করোটি ও কিছু চুল ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের দেখিয়ে বললেন 'তুষারমানব' নেই। কিন্তু জনৈক প্যারিসের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দিলেন যে চুল ও করোটি একই জীবের নয়। তাহলে পায়ের ছাপগুলো কিসের? তিনি বললেন এক ধরনের শেয়াল দল বেঁধে গিয়েছে। এবং প্রতিটি শেয়াল অগ্রবর্তীর পদচিহ্নের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে পা রেখে যাওয়ায় ছাপগুলোর আকৃতি বৃহৎ হয়ে গেছে। এ ব্যাখ্যা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিজ্ঞানীরা জানেন এমন কোন শৃগাল ঐসব অঞ্চলের ধারে কাছেও বাস করে না। তাছাড়া বুড়ো আঙুলের ছাপ অতি স্পষ্ট,

.সসব চিহ্নে এবং চিহ্নকারা জীব নিশ্চয়ই শৃগালের চেয়ে অনেক বেশী ভারী। এসব প্রশ্নের কোন জবাব হিসারী দেননি। সুতরাং 'ইয়েতি' নেই একথা প্রমাণ হয়নি। তাছাড়া নেপালের পাঙ্গবোচী নামক স্থানে একটি মনস্টারিতে দু-তিনটি মমি-করা হাত রক্ষিত আছে। টোকিওর প্রফেসার টেইজো ওগাকুয়াই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেগুলোর ফটোগ্রাফ নিতে সমর্থ হন। তাছাড়া সোভিয়েট একাডেমী অফ সায়েন্সের প্রফেসার বি. এফ. পর্শনেভও স্বীকার করেছেন যে 'তুষারমানব' আছে। মধ্য এশিয়ার একস্থানে প্রাপ্ত চিহ্নের সঙ্গে ইতালীর গুহায় প্রাপ্ত ৫০,০০০ হাজার বছর আগেকার নিয়েনদারথেলার মানবের রক্ষিত একটি পদচিহ্নের হুবহু মিল দেখা যায়।

এই তুষারযুগের মানবকে বা মানবদের হয়ত বা হিমালয়ে আজকের যুগে কোন পণ্ডিত বা বিজ্ঞানী স্বচক্ষে কাছাকাছি দেখেননি, তবু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী এদেরই জাতভাইদের বিভিন্ন সব স্থানে কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি ১৯২১ সালে কর্ণেল সি কে. হাওয়ার্ড ব্যারি এভারেষ্ট অভিযানে গিয়ে বিখ্যাত লাফ-কাগা গিরিবর্ত্মে যেতে থার্টা নামক স্থানে যখন তাঁরা পৌঁচেছেন, তখন দলের একজনের নজরে পড়ে তাদের কাছ থেকে বহুদূরে এবং উচ্চে তুষারের মধ্য দিয়ে কালো কালো কারা যেন হেটে যাচ্ছে। পরে সেই স্থানে যখন তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন, বহু পায়ের ছাপ পড়ে আছে এবং সেগুলি সাধারণের চেয়ে তিনগুণ বড়। কর্ণেল বারি ভেবেছিলেন ওগুলো কোন নেকড়ের পায়ের ছাপ, কিন্তু শেরপারা প্রতিবাদ করে বললে, এটা মেহ্-টেহ্-এর ছাপ। এই শব্দটি জনৈক ভারতীয় টেলিগ্রাফারিস্ট শোনে 'মেটো-কাঙ্গামি' বলে (তিব্বতীয় ভাষায় যার অর্থ হল, 'তুষারমানব')। সেই থেকে উক্ত নামটি চলে

আসছে। আরো অনেকে এরকম ছাপ দেখেছে বলে জানায়। হিউগ নাইট নামে একজন সাহেব একদা নাকি একেবারে মুখোমুখি হয়েছিলেন এ রকম একটি মানবের সঙ্গে, হাতে এবড়ো খেবড়ো তীর, ধনুক, অঙ্গ লোমশ। এলওয়েন নামক জনৈক বোটানিষ্ট লণ্ডন জুলজিকাল সোসাইটিকে একবার সংবাদ দেন যে তিনি নাকি ১৯১৬ তে এই ধরনের একটি জীব দেখেছিলেন। এরপর আরও দু'একজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় এদের স্বচক্ষে দেখেছেন বলে শোনা যায়।

ককেসাস পর্বত ও কাস্‌পিয়ান সাগরের মাঝে অবস্থিত ডাগেস্থান-এর কনজারভেসান ডিপার্টমেণ্টের কর্তা প্রফেসার ভি. কে. লিয়নটিয়েভ এই ধরনের একটি তাজ্জব মানুষকে হাতে নাতে পাকড়াও করবার সুযোগ পেয়েও পারেননি। বিশাল অরণ্যে ঘোরবার সময় একদিন সহসা তিনি হাত পঞ্চাশ দূরে একটি অদ্ভুতাকৃতি মানুষকে দেখতে পান, তাকে দেখে লোকটা বহুদূরে চলে যায়। লম্বা সাত ফিট্, লোমশ দেহ, মোটা পা, বৃহৎ পায়ের পাতা. পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা বেশ বড়। তিনি ওর পা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন, কিছুটা টাল খেয়েও প্রাণীটি অবিশ্বাস্য গতিতে খাড়াই একটা পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আরেকটি কাহিনী পাওয়া যায় জনৈক ওলন্দাজ পণ্ডিতের জাভায় প্রকাশিত সায়েন্টিফিক জার্নাল থেকে। ভদ্রলোকের নাম মিয়েনহিয়ার ভ্যান হারওয়ার্ডেন। ১৯২৩ সালে সুমাত্রা দ্বীপের পোল নামক নদীর ধারে তিনি একদিন বুনো শুয়োর শিকারে গিয়েছিলেন। বনের গভীরে সহসা তিনি দেখেন একটা গাছ বেয়ে কালো লোমে ঢাকা এক বিচিত্র মনুষ্যাকৃতি প্রাণী উঠে যাচ্ছে। তিনিও গাছ বেয়ে উঠতে লাগলেন। প্রাণীটি আরও উপরে উঠে গেল। তখন তিনি নানারূপ ইঙ্গিতে তাকে কাছে আসতে বললেন। কিন্তু প্রাণীটি একটা ছোট ডালে পা দিতেই, ডাল ভেঙ্গে প্রায় পনের

ফিট নীচে মাটিতে পড়ে ছুটে পালাতে লাগল। গারওয়ার্ডেন রাইফেল তাগ করলেন। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে মায়া হল। কারণ একমাত্র ঝাঁকড়া লোম বাদে প্রাণীটি পুরোপুরি মানবসদৃশ। প্রাণীটি স্ত্রী জাতীয়, কাছাকাছি জঙ্গল থেকে এক বিচিত্র আওয়াজের ডাক শোনা যাচ্ছিল, হয়ত ওর পুরুষ সঙ্গী ওকে ডেকে চলেছে।

এবার ক্যানাডার কাহিনী। ১৯৫৫ সালে উইলিয়াম রো নামক এক শিকারি অ্যালবার্টার অন্তর্গত মাইকা পর্বতে একদিন শিকারে গিয়েছেন। বহু উচ্চে এক বনের মধ্যে সহসা একটি প্রাণী তাঁর নজরে পড়লো, প্রথমে ভাবলেন ওটা একটা গ্রিজলী ভালুক, কুড়ি গজ সামনে গাছ থেকে জাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সহসা প্রাণীটি ঘুরে দাঁড়াতে মিঃ রো হতবাক হয়ে দেখলেন লোমে আবৃত এটি একটি মানবী। দুজনে চোখাচোখি হল। যথারীতি রাইফেলে হাত গেল কিন্তু ট্রিগার তিনিও টানতে পারলেন না মমতাবশত। প্রাণীটি অদ্ভুত এক আধা অট্টহাসি আধা আর্তনাদ মেশানো চিৎকার করে দুপায়ে লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। তিনি পরে ঐ মানবীটির বাসস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। কি খায়, কোথায় শোয় সবই সন্ধান করেছিলেন কিন্তু প্রাণীটিকে আর দেখা যায়নি। বছর পাঁচেক আগে কালিফোর্ণিয়ার দুজন ডাক্তার অধিক রাত্রে স্যাক্রামেণ্টো ভ্যালির রেডিং নামক এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথের পাশে একজনকে বসে থাকতে দেখে তাঁরা গাড়ির হেড লাইট স্তিমিত করে গতি শ্লথ করে আনলেন। ভাবলেন পথচারীকে গাড়িতে তুলে নেবেন। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই বসে থাকা জীবটি ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বিরাট দেহ নিয়ে পেছনদিকের ঝোপে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এসব তো গেল শুধু চোখে দেখা। এবার হাতেনাতে ধরার কাহিনী। এ কাহিনীটি আছে সোভিয়েট আর্মি মেডিকেল

কোরের রিপোর্টে। ঘটনাটি ১৯৪১-এর। লেঃ কর্নেল ভি. এস. কারপেটিয়ানের ব্যাটালিয়ান তখন বুইনক্স্‌ শহর থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত (ডাগেস্তানে)। একদিন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জনৈক অফিসার এসে লেঃ কর্নেলকে অনুরোধ করলো একটি লোককে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। সেই লোকটিকে নাকি পাহাড়ে ধরা হয়েছে। লোকটি কোন গুপ্তচর কিনা সেটাই পরীক্ষা করতে হবে তাকে।

বাইরের একটি চালাঘরে লোকটিকে রাখা হয়েছে। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে এভাবে ঠাণ্ডা ঘরে রাখবার উদ্দেশ্য কি ? প্রশ্ন করাতে স্থানীয় লোকটি জানায় যে, ধৃত ব্যক্তিকে গরম ঘরে রাখা হয়েছিল কিন্তু সে এমনভাবে ঘামতে শুরু করল যে, বাধ্য হয়ে বাইরের এই হিমশীতল চালাঘরেই তাকে রাখতে হয়েছে। বিস্মিত হলেন লেঃ কর্নেল, ডিসেম্বরে ঘাম। বিস্মিত হবার আরও বাকী ছিল। ঘরে ঢুকে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ, খালি পা একটি পুরুষ মূর্তি। হ্যাঁ মানুষই, তবে অদ্ভুত মানুষ। বুক পিঠ ও কাঁধ ঘন লোমে ঢাকা, বাদামী রঙের লোম। (স্থানীয় লোকেদের চুল কিন্তু সব কালো রঙের)। লোমগুলো ভালুকের মত লম্বা, প্রায় ২।৩ সেন্টিমিটার। বুকের কাছের লোম কিছুটা পাতলা। কব্জিটা কর্কশ, হাতের বা পায়ের তালুতে কোন লোম নেই। মাথার চুল কাঁধ অবধি নেমেছে। কপাল ছোট, মুখে কোন দাড়ি বা গোঁফ নেই। কিন্তু সারা মুখ পাতলা ছোট ছোট লোমে আবৃত। লোকটি বাহু ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুটের মত। লেঃ কর্নেলের কাছে তাকে দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল। উন্নত বক্ষপ্রদেশ। আঙুলগুলি পুরু ও শক্তিশালী আর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মানবাকৃতি বিশালদেহী সে।

তার চোখে কোন ভাষা ছিল না। অত্যন্ত নিস্তেজ ও ফাঁকা

দৃষ্টি প্রাণীদের মত। জন্তুর মতই তাকে মনে হচ্ছিল লেঃ কর্নেলের। ধরা পড়ার পর থেকে সে কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেনি। সে কোন কিছু চায়নি বা কোন কথা বলেনি। গরম ঘরে ঢোকাবার পর প্রচুরভাবে ঘামছিল সে। লেঃ কর্নেলের উপস্থিতিতে একজন ওর মুখের কাছে কিছু খাদ্য এবং পানীয় ধরলো—কিন্তু ওর তাতে কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল না। লেঃ কর্নেল বললেন, এ কোন ছদ্মবেশী গুপ্তচর আদৌ নয়। এ একজন বর্বর ও বন্য-মানুষ। এই বলে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ক্যাম্পে। তার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ তিনি রাখেননি।

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার শকলাণ্ডে একটি এই ধরনের তুষারযুগের মানব ধরা পড়ে, যার নাম দেওয়া হয় 'ইশি'। লোকটার হাতে প্রস্তর নির্মিত একটি অদ্ভুতাকৃতি অস্ত্র ছিল। যে মানব প্রশাখা ২০,০০০ হাজার বছর পূর্বে নির্বংশ হয়ে গিয়েছে বলে ভাবা হয়েছিল তাদেরই একজন কি করে দেখা দিল এই বিংশ শতাব্দীতে সেকথা ভেবে বৈজ্ঞানিকগণ অবাক মেনে গেলেন। ঠিক সেই চেহারা, সাত ফুট লম্বা বন্য আকৃতি, হাত পা চেপ্টা ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অতি বৃহৎ, মুখে নেই কোন ভাষা—শুধু বন্য প্রাণীর মত বিচিত্র চিৎকার। নিম্নাঙ্গে স্থান বিশেষে একটা গাছের বাকলের সামান্য আবরণ ছাড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছিল সে। কয়েক বছর বন্দী অবস্থায় থেকে সভ্য মানুষের রোগ যক্ষ্মায় সে মারা যায়।

চীন দেশেও কয়েক বছর পূর্বে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে তারা নাকি পরিপূর্ণ বন্য,ভাষাহীন একটি মানুষকে পাকড়াও করেছে ইউনান প্রদেশের নির্জন সীমান্ত প্রদেশে। সে মানুষটি আগুনের ব্যবহার জানে না, কোন অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, দেহে কোন আবরণ ছিল না। তাকে ধরে রাজধানী কুনমিং-এ আনা হয়েছিল।

সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের জ্ঞাত-ভাইদের মত হিমালয়ের রহস্যময় প্রাণী, তুষারমানবও কোন না কোনদিন আচমকা কোন না কোন এক পর্বতারোহী বীরের সামনে পড়ে যাবেই এবং কালক্রমে সভ্য মানুষের হাতে সশরীরে তার ধরা না দিয়ে রেহাই নেই।

দারুভুত বিষকন্যা

বিষকন্যা বলতে কি বোঝায়? যে মেয়ের পাল্লায় পড়লে জীবনহানি হয়। বিষ-কন্যা—কন্যা তো বটেই। এবং মৃন্ময়ীও নয়, মানবী বা দানবীই বটে। তারা রূপের খোলসে থাকে, তারা লুব্ধকারী যৌবন নিয়ে আসে, আনে মাখম-কোমল যৌনদেহের আকর্ষণ। কিন্তু কে কবে শুনেছে, একটি তরুণী নারীর অর্ধনগ্ন কাষ্ঠ নির্মিত স্ট্যাচু, যার বিচিত্র রূপে বিহ্বল হয়ে, তার দুর্নিবার প্রেমের টানে কয়েকটি সুস্থ সবল মানবপুত্র জীবনদান করেছে কিংবা পাগল হয়ে গিয়েছে?

গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত ভাস্কর পিগম্যালিয়ন নাকি এমন রূপবতী একটি নারীর মূর্তি গড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি তারই প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে যান। তবে তিনি পুরাণের ভাস্কর। সেটা হলো কাল্পনিক রূপকথার সামিল।

কিন্তু এ যুগে এই প্রকার নিকষিত প্রেমের বিচিত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইতালীস্থ বন্দর লা স্পেজিয়া (জেনোয়ার নিকট) নগরের মিউজিয়মে রক্ষিত একটি মনোহর নারী মূর্তির দ্বারা। কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিটির নাম, 'অ্যাটলাণ্টা'। সোনালী চুলওয়ালা গাউন পরিহিতা (সে গাউন আবার দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে একটি স্তনকে উন্মুক্ত করেছে) এই রকম একটি সুন্দরী তরুণীর মূর্তি হল 'অ্যাটলাণ্টা'। একদা এই মূর্তিটি ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন সমুদ্রগামী জাহাজের অগ্রভাগে শোভা পেত কিন্তু বর্তমানে এসে স্থান নিয়েছে ইতালীর উক্ত মিউজিয়মে।

এই মিউজিয়মের কিউরেটারের হয়েছে মহাজ্বালা। এখন তাকে লোক ঠেকাতে হয়। সেই সব মারমুখী জনতা, যারা ঐ দারু-কন্যার

ভয়াবহ আর সর্বনাশী গল্প শুনে মূর্তিটাকে পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ছুনিয়ার দূর দূরান্তের দেশ থেকে 'ওয়ার্নিং' দেওয়া চিঠি আসছে অহরহ। ইতালীয় পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্য এই রকম একটি বিল আনেন যাতে করে পুরনো দিনের ডাইনীদের মত ঐ ভাস্কর্যটিকে দগ্ধ করে ফেলা যায়।

'অ্যাটলাণ্টা' সম্বন্ধে নানা সত্য মিথ্যা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। এর নাকি একটা অপার্থিব মায়াজাল আছে। বিষাক্ত সম্মোহনী শক্তি—যার টানে মানুষ বিহ্বল হয়ে যায়।

কথিত আছে যে ১৮৬৬ সনে অতলান্তিক মহাসাগরে যাবার সময় ইতালীয় জাহাজ 'ভেলোস'-এর জনৈক নাবিক প্রথম লক্ষ্য করে জলের মধ্যে একটি নারী মূর্তি ভাসছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন শুনে তক্ষুনি জাহাজ কাছে নিয়ে গিয়ে ওটাকে তোলে। তখন দেখা যায় ওটা মানুষ নয় ওটা একটা দারুমূর্তি—তলায় লেখা— "অ্যাটলাণ্টা"।

কোন্ জাহাজে ছিল, সে জাহাজটার কি নাম, কিভাবেই বা এটা জলে পড়লো, সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা জানে না। 'ভেলোস' জাহাজ বহুকাল ঘুরে তবে ইতালীতে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে উক্ত জাহাজের বহু নাবিক মূর্তিটির এত বেশী ভক্ত হয়ে পড়ে, যে অনেকেই উক্ত যৌবনময়ী অপরূপ মূর্তির কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোহিত হয়ে আচ্ছন্নের মত বসে থাকতো। শোনা যায় শেষ পর্যন্ত ঐ নারী মূর্তিকে ঘিরে এমন এক সাংঘাতিক বাদ বিসম্বাদ ও প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়ে যায় যে বাধ্য হয়ে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, ক্যাপ্টেন 'অ্যাটলাণ্টা'কে একটি কেবিনে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে রাখে।

জাহাজ এসে বন্দরে লাগে। 'অ্যাটলাণ্টা'কে তখন নেভাল মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। উক্ত মিউজিয়ামে আরও

তিরিশটি দারু নির্মিত নারীমূর্তি ছিল। যেহেতু সেগুলি অনেকটা জঙ্গীমূর্তি অর্থাৎ পেশী বহুল, মাথায় হেলমেট ও হাতে বর্শা-ধারিণী মূর্তি, সেহেতু 'অ্যাটলাণ্টা'ই সর্বাধিক কমনীয় নারী মূর্তিরূপে দর্শকদের লালসাময় প্রশংসা কুড়োতে লাগল।

১৯২৪ সনে মিউজিয়ামে একজন মধ্য বয়স্ক লোক নিযুক্ত ছিল। তার কাজ ছিল মূর্তিগুলোকে ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করে রাখা। এক রকম নিজের অজ্ঞাতসারেই সে 'অ্যাটলাণ্টার' পরম ভক্ত হয়ে পড়ল। এ-কে সে শতবার মোছে—এরদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। সব কিছু সে ভুলে যায় 'অ্যাটলাণ্টা'র সামনে এলে। চোখ আর ফেরাতে পারে না, মূর্তির যৌন আকর্ষণে তার ইহকাল পরকাল একাকার হয়ে যায়। একদিন মুছতে গিয়ে, ঝট করে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সহসা সে 'অ্যাটলাণ্টাকে' আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আদর করতে থাকে।

দুর্ভাগ্যবশত সে সময় আরও কয়েকজন সহকর্মী সেখানে এসে উপস্থিত। সবাই এ ব্যাপার দেখে সকৌতুকে হেসে উঠলো, আরে ও দেখছি মূর্তিটার প্রেমে পড়েছে। ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে রে।

সেই থেকে শুরু হল ঠাট্টা মস্করা। সহকর্মীদের অনবরত পরিহাসও মধ্য বয়স্ক লোকটির মূর্তি-প্রীতি কমাতে সক্ষম হল না। তার স্ত্রীর কানে গেল কথাটা। এই নিয়ে গৃহে ঝামেলা। ভুল বুঝে লোকটা চেষ্টা করতে লাগলো 'অ্যাটলাণ্টাকে' এড়িয়ে যাবার। কিন্তু ঝাড়াপোঁছা তারই কাজ। সুতরাং যেতেই হয় কাছে। আর কাছে গেলে একবার আলিঙ্গন না করে কিছুতেই ফিরে আসতে পারে না। সংবাদটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। লা স্পেজিয়া শহরের যেখানেই সে যায় লোকে তাকে আঙুল দেখিয়ে হাসে—ঐ যে, ঐ যে যাচ্ছে পাগলাটা! 'অ্যাটলাণ্টা' প্রেমিক হতভাগা।

এক রাত্রে নীরবে সে গেল সমুদ্রের ধারে। পরদিন লবণাক্ত জলে তার ভাসমান মৃতদেহ পাওয়া গেল—'অ্যাটলাণ্টা'কে যেমন পাওয়া গিয়েছিল অতলান্তিক মহাসাগরে। দারুময়ীর প্রথম বলি।

দিন যায় রাত আসে। বন্দরে অগনিত জাহাজ যাওয়া আসা করে। বছরের পর বছর ঘোরে।

১৯৪৩। জার্মান বাহিনী এসে গুরুত্বপূর্ণ লা স্পেজিয়া বন্দরটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। মিউজিয়ামের কিউরেটারের সঙ্গে পরিচয় হয় জার্মান সামরিক অফিসার এরিথ কুরজ এর সঙ্গে। ধর্মভাবাপন্ন এই তরুণ অফিসারটি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী। তিনি লা স্পেজিয়াব পিযাজা ভেরডি অঞ্চলে একটি ঘরভাড়া নিয়ে বই-এ বই-এ ঘরটি ভর্তি করে ফেলেন। লেফটেন্যাণ্ট কুরজ বহু রকম ভাষা পডতে ও লিখতে পারতেন। তবে নিজেব বিদ্যা জাহির করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। অত্যন্ত মিতবাক যুবক। তিনি মাঝে মাঝে কিউরেটারের কাছে গিযে এক আধ ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন। চুপচাপ উদাসীন দৃষ্টি। কাছে থেকেও যেন বহু দূরে অবস্থান করছেন।

এইভাবে বছর খানেক কাটবার পর একদিন কিউবেটারের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে লেফটেন্যাণ্ট যুবক ঢুকলেন সেই ঘরে যেখানে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন নারী মূর্তিগুলি।

উদাসীন, মিতবাক যুবক ঘুরতে ঘুরতে 'অ্যাটলাণ্টার' সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। আবেগমাখা কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ মূর্তি আমার চাই!

কিউরেটার ফিরে চাইল।

—আমি ট্রাক পাঠিয়ে দেব, কুব্‌জ বললে।

কিউরেটার ঘাড় নাড়লো। জার্মানরা কর্তৃত্বে অবস্থিত। ঘাড না নাড়লে ঘাড় থাকবে না ধড়ে। তারা যা চায় তাই পায়—এই

নিয়মে। 'অ্যাটলাণ্টার' ভয়াবহ পূর্ব ইতিহাস বলবার সময়ই পেলনা কিউরেটার।

কুর্জ 'অ্যাটলাণ্টা' নিয়ে তুললো তার ঘরে। সেখানে সে কি করলো কেউ জানেনা। প্রায় মাসখানেক সে মূর্তিটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখলো। তার কোন বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালো না। যেন কিছুই গোপনীয় নেই এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগলো।

এরপর ১৯৪৪ সনের ১৩ই অক্টোবর কুর্জ কাজে গেল না। লা স্পেজিয়ার চতুর্দিকে সরকার ও জার্মান বিরোধী ইতালীয়-দেশপ্রেমিকেরা ইদানীং অতি তৎপর ভেবে কমাণ্ডার সবিশেষ চিন্তিত হয়ে নিজে চলে গেলেন কুর্জ-এর পিয়াজা ভেরতি অঞ্চলের ভাড়া করা ঘরে। দরজা বন্ধ। ভেঙে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই চমকে গেলেন। 'অ্যাটলাণ্টা' মূর্তিটির পদতলে পড়ে আছে কুর্জ। সার্ভিস রিভলবার তখনও ধরা। কপালে গুলির গভীর ক্ষত। মোহময়ী দারুমূর্তি 'অ্যাটলাণ্টার' দেহে নীলাভ-এক টুকরো কাগজে এক বিদায় বাণী লিখে পিন দিয়ে আটকে রেখে গেছে সে। পত্রটি এইরূপ :

"যেহেতু আর কোন নারী আমার জীবনকে স্বপ্নময় রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেনি—যেমন ভাবে তুমি আমাকে নিয়ে গেছ—তাই 'অ্যাটলাণ্টা' আমি আমার জীবন উপচার হিসেবে তোমাকে অর্পণ করলাম।"

এরিখ কুর্জ।

আজও পত্রটি উক্ত মিউজিয়ামে আছে।

যুদ্ধ শেষ হল। 'অ্যাটলাণ্টা'কে ফিরিয়ে আনা হল পুনরায় নেভাল মিউজিয়ামে। জার্মানরা ফিরে গেছে স্বদেশে পরাজিত

হয়ে। অনেক দিন পর্যন্ত মূর্তিটিকে মাটির তলায় এক ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়েছিল। ওপরে রাখা উচিত হবে কিনা, নিরাপদ হবে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুকাল কর্তৃপক্ষদের মধ্যে গভীর আলোচনার পর স্থির হয়েছে, দেখা যাক না ঝুঁকি নিয়ে। বর্তমানে সামনের হলে গ্রীক পুরাণের পিগম্যালিয়ান নির্মিত প্রখ্যাত মূর্তির অনুকরণে তৈরী একটি নারী মূর্তির পাশে রাখা হয়েছে সর্বনাশী মোহময়ী অ্যাটলাণ্টাকে।

অনেকে ঠাট্টা করে, 'আপনি মশাই কোন দিন না ওর প্রেমে পড়ে পাগল হন!'

উত্তরে কিউরেটার হেসে বলে, 'ইতালীতে রক্তমাংসের মোহময়ীর কি ঘাটতি আছে যে কাঠের স্ট্যাচুর জন্যে মরতে যাব।'

সেই লাইট-হাউসটি

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিন। প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের রাত। লচরাওগের বন্দরে দাঁড়িয়ে সারাটা রাত অস্থির ভাবে ছটফট করে কাটাল জোসেফ মুর। উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কি এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুক।

বন্দর থেকে ঝড়-বিক্ষুব্ধ সতেরো মাইল সমুদ্র পথ পেরিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফ্ল্যানান দ্বীপপুঞ্জ। নাবিকদের কাছে 'সাত-শিকারী' নামে পরিচিত সাতটি ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ। তাদের মধ্যে বৃহৎ দ্বীপটিতে অর্থাৎ লিয়ান মর নামক দ্বীপটিতে গড়ে উঠেছে নতুন লাইট-হাউস, বছর খানেক পূর্বে। যে চারজন মানুষ এই লাইট-হাউসটির তত্ত্বাবধান করে জোসেফ তাদের একজন; ছুটিতে এসেছিল সে। কিন্তু ছুটির শেষে আজ দু'দিন ধরে বন্দরে আটকে পড়ে আছে সে। প্রবল ঝড়ে দ্বীপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষেপা সমুদ্র শান্ত না হলে কোন ষ্টীমারের পক্ষে লাইট-হাউসের সে দ্বীপটির ধারে-কাছে যাওয়াও কল্পনাতীত।

চিন্তা বা আশঙ্কা কিন্তু না পৌঁছনোর জন্যে নয়। আসলে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সে এক'দিন। দু'রাত্রির মধ্যে একবারও সে লাইট-হাউস থেকে বিন্দুমাত্র আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখে নি। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৭৫ ফিট উর্ধ্বে থাকা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের লাইট-হাউসটি কি কারণে নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল? এ যে অসম্ভব, অকল্পনীয়। কি কারণ থাকতে পারে আলো না জ্বলবার? সহকর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে? সবাই একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যান্ত্রিক গোলযোগ? তাও অসম্ভব। আধুনিক শক্তিশালী যন্ত্রাদি বলা

নেই কওয়া নেই, ধাঁ করে খারাপ হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। গেলেও পর পর সবগুলো একজোটে খারাপ হয়ে যাবে কেন?

তীরের সবাই উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত। এই ভাবে শুরু হল সমুদ্র-রহস্যের বিরাটতম এক বিস্ময়। অনুসন্ধানকারী গবেষকবৃন্দ হতবাক হয়ে গেল এ রহস্যের কিনারা করতে। আজ পর্যন্তও কোন কূল কিনারা কেউ পায়নি।

ঘটনাটা অনুধাবন করতে হলে উত্তর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। মোটামুটি শিলা-গঠিত ক'টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ফ্ল্যানান বিশ্বের নির্জনতম দ্বীপমালা। এতাবৎ সমুদ্র পথিকরা এ দ্বীপপুঞ্জকে পরী হুরীদের আস্তানা বলে বিশ্বাস করত। এর ধারে-কাছে দিয়েও কখনো জাহাজ ঘেঁষত না। এমন কি এদের নাম পর্যন্ত তারা মুখে আনত না। দ্বীপগুলির তিন-চারটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন কোন অজ্ঞাত অসভ্য উপজাতীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ছিল। তারপর একটানা দু' শতাব্দী ফাঁক। কোন মানুষ সেখানে পদার্পণ করেনি। এর আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে সেণ্ট-ফ্ল্যানান নামে জনৈক বিশপ সংসার ত্যাগ করে এসে এই লিযান মর দ্বীপে ছোট্ট একটি গীর্জা তৈরী করেন। বহুদিন তিনি একা সেই নির্জন দ্বীপে বাস করেন। কথিত আছে, সমুদ্র পাখিদের সঙ্গে থেকে থেকে তিনি তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন। পাখি-গুলোও তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি ঠোঁটে করে মাছ নিয়ে আসত বিশপের জন্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কয়েক বছর সাংঘাতিক শীত-তুষারে আচ্ছন্ন হল দেশ। কয়েকজন দুঃসাহসী মেষপালক ভেড়ার পাল নিয়ে এল শ্যামল ঘাসে ভরা ফ্ল্যানান দ্বীপপুঞ্জে। তবে রাত্রিবাস সেখানে কেউ করত না—হাজার ঝঞ্ঝা হলেও মেষ-পালকেরা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসত ডাঙ্গা-ভূমিতে। ১৮৯০ নাগাদ

ব্যবসা-বাণিজ্যর প্রসার হওয়ায় বহু জাহাজের যাতায়াত শুরু হয় দ্বীপগুলির কাছ দিয়ে। এবং শুরু হয় নানা ভয় ও আতঙ্ক।

রাত্রির অন্ধকার ও গাঢ় কুয়াশায় বহু জাহাজ বিনষ্ট হয় ঐ শিলাগঠিত দ্বীপগুলিতে ধাক্কা খেয়ে। লোকসান আরও বাড়বার আগেই নর্দার্ণ লাইট বোর্ড স্থির করল এই লিয়ান মর-এ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত আলো-বিকীরণকারী এক লাইট-হাউস তৈরি করবে।

সার্ভেয়ারগণ সেণ্ট ফ্ল্যানান চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষের ওপর শ' পাঁচেক গজ ডিম্বাকৃতি স্থানের উপর স্থান নির্বাচন করল।

ইট পাথর চুন বালি কড়ি বরগা ও ভারী ভারী কল-কব্জা প্রভৃতি এসে গেল। তৈরি করতে দু'বছর লাগবার কথা—লাগল চার বছর।

ডিম্বাকৃতি টিলার দুপাশে দুটি ল্যাণ্ডিং তৈরি করা হল। যে কোনদিকের ঝড়-বাদলে যাতে অপর ল্যাণ্ডিংটি ব্যবহার করা যায়।

১৮৯৯ তে নয়নাভিরাম লাইট-হাউসটি তৈরি হবার পর একটানা এক বছর ধরে রাত্রিকালে চতুর্দিক উদ্ভাসিত আলোর দ্বারা এটি জাহাজ ও নাবিকদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করে তুলল। অবশেষে সেদিন মুর গেল ছুটিতে আর বিপুলকায় বাতি-স্তম্ভ যেন সহসা এক ফুঁয়ে নিভে গেল।

লচ-রাওগ বন্দরে আরেকটি জিনিসও যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিল। সে হল চিঠিপত্র ও মাল ইত্যাদি বহনকারী স্টীমার 'হেসপেরাস্'। মুরের নির্বন্ধাতিশয্যেও ক্যাপ্টেন স্টীমার ছাড়তে রাজী হল না এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়।

মুর ছাড়া লাইট-হাউসে তখন কর্মচারী ছিল তিন জন : জেমস ডুকাট, ডোনাল্ড ম্যাকআর্থার এবং টমাস মার্শাল।

রাত ভোর হলে হাওয়া পড়ে এল। ঝড় থেমে গেল। আকাশ

হল স্বচ্ছনীল। স্টীমার এবার যাত্রা শুরু করল লাইট-হাউসের দিকে। সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনিদ্রায় রক্তচক্ষু অস্থিরমতি মুর। সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় মন তোলপাড় করছে তার।

ঝড় থেমেছে বটে কিন্তু তরঙ্গমালা রয়েছে উত্তাল তখনও। খুব সাবধানতা সহকারে ক্যাপ্টেন স্টীমারটাকে ঘুরিয়ে নিযে দ্বীপের পূর্বদিককার ল্যাণ্ডিং-এর কাছে নিয়ে এল। সলিল-লুপ্ত বিপজ্জনক টিলাগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে ভেতরে ঢোকবার বার কয়েক চেষ্টা বিফল হল প্রথমে। তারপর কোনক্রমে ঢুকে দূর থেকে সিগনাল পতাকা তুলে দিল। অন্যবার উত্তর আসে লাইট-হাউস থেকে পতাকা উত্তোলন করে। এবার কিন্তু কোন পতাকা উড়ল না সেখান থেকে।

মুর দেখল, জেটিতে সাধারণতঃ স্টীমার আসবার আগে থেকে যেভাবে ব্যবস্থা হয়, তা কিছুই করা হয়নি। পুরনো খালি বাক্স জমা করা হয়নি, কোন লোক আসেনি, কোন দড়ি-দড়া নামানো হয়নি।

বাইনাকুলার দিয়ে ক্যাপ্টেন সারা দ্বীপটি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলেন। কোন জনমানবের চিহ্ন দেখতে পেলেন না তিনি।

প্রবল স্রোত ও ভয়াবহভাবে আছড়ে পড়া ঢেউ সত্ত্বেও মুর পাড়ে নামবার জন্য প্রস্তুত হল।

স্টীমার থেকে নৌকা নামিয়ে পালোয়ান ধরনের কয়েকজন মাল্লা নিয়ে অতি কষ্টে গিয়ে জেটিতে নামল মুর।

এক লাফে তীরে নেমে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত সে উঠে গেল স্টেশনে। সামনের গেট ও ভেতরের দরজা বন্ধ। দুহাতের চেটো মুখের কাছে গোল করে চিৎকার করে সে ডেকে উঠল সহকর্মীদের নাম ধরে। কোন উত্তর নেই। এক মুহূর্ত পরে মুর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। স্টেশনে কেউ নেই। সামনের ঘরে ফায়ার-প্লেসের ছাই ঠাণ্ডা অবস্থায় রয়েছে, ঘড়িটা বন্ধ। শোবার

ঘরগুলি যথারীতি পরিচ্ছন্ন। কেউ যে সম্প্রতি ব্যবহার করেছে বিছানা—এমন মনে হল না। বাক্সে ময়লা পোশাকগুলি নিয়মমাফিক সাজানো রয়েছে।

ঘোরানো লোহার সিঁড়ির কাছে এসে বহুবার সহকর্মীদের নাম ধরে সে ডাকল। বাতি স্তম্ভের দেওয়ালে দেওয়ালে সে চিৎকারের প্রতিধ্বনি হাহাকার করে ফিরল। কিন্তু তবুও কাউকে দেখা গেল না। এত সাংঘাতিক, এযে অবিশ্বাস্য···অকল্পনীয়।

মুর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। না, একা ওঠা ঠিক নয়। কে জানে ওপরে কি বিভীষিকা অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। দৌড়ে গিয়ে তুজন মাল্লাকে ডেকে নিয়ে এল। একসঙ্গে এবার ওরা উঠে গেল ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে।

নীচের মত ওপরের অংশটিতেও কেউ নেই—জনশূন্য। জিনিসপত্র নিখুঁত ভাবে সাজানো-গোছানো। তাহলে মানুষ তিনটে গেল কোথায়? তাদের কি এই অদ্ভুত দ্বীপের অজানা প্রেতাত্মারা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল? তাদের নির্জনতা হরণ করেছে বলে কি তারা প্রতিশোধ নিল?

মুর ঘটনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। চীফ তত্ত্বাবধায়ক ডুকাটের রেকর্ড স্লেটে দেখা গেল শেষ লেখা: ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার সকাল ন'টা।

দেখা গেল বিশাল আলোর পলতেগুলি ঠিক মত পরিষ্কার করা, কাটা, ফোকাসের কাঁচগুলি মোছা, তেল-সরবরাহ আধার যথাযথ প্রস্তুত। রান্নাঘরে বাসন-কোসন ধোয়া-মোছা-পরিচ্ছন্ন তুপুরের সব কাজ সমাপ্ত। বোঝা গেল, যাই ঘটুক, তা ঘটেছে এক হয় সকালের দিকে বেলায়, কিংবা বিকেলে এবং ঐ ১৫ তারিখেই।

সারাদিন ধরে স্টীমারের লোকেদের নিয়ে মুর ছোট্ট দ্বীপটির সর্বত্র তন্নতন্ন করে সব কিছু অনুসন্ধান করে ফিরল।

কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া গেল না। তিন-তিনটে জলজ্যান্ত মানুষ লাইট-হাউসটিকে অন্ধকার করে দিয়ে আজগুবি ধরনে উধাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যের আগেই বাধ্য হয়ে স্টীমার ফিরে এল লচ রাওগ বন্দরে—সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মালপত্তর ফের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হল।

একা মুর রয়ে গেল সেই লাইট-হাউসে। একাই সে লাইট জ্বালাল, ঘরের আগুন-চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করল। অন্ধকার আবৃত করেছে চরাচর। অ্যাট্‌লান্টিকের প্রবল গর্জন, ক্রমাগত ক্ষ্যাপা ঢেউ সগর্জনে আছড়ে পড়ছে শিলাসংকুল উপকূলভাগে। মুর মাঝে মাঝে চমকে উঠছে···সিঁড়িতে যেন কাদের পায়ের শব্দ। কিন্তু কেউ উঠে এল না।

দুদিন বাদে একদল অফিসার-সহ ফিরে এল স্টীমারটি। অনুসন্ধানকারী দল। ইতিমধ্যে মুর খুঁজে পেতে দেখেছে যে মার্শাল ও ডুকাটের সমুদ্রবুট এবং বর্ষাতিগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। জেটিতে যেতে গেলেই এগুলি পরতে হয়।

পুবদিকের ল্যাণ্ডিং-এতেই প্রথম অনুসন্ধান শুরু হল। দড়ি এবং লাইফবেল্টগুলি ঠিক তেমনটিই রয়েছে যেমনটি দু-সপ্তাহের ছুটিতে যাবার পূর্বে মুর দেখে গিয়েছিল।

পশ্চিম দিকের জেটিতে দেখা গেল ঝড় তুফানের কিছু ক্ষয়ক্ষতি। জলপৃষ্ঠ থেকে পঁয়ষট্টি ফিট উচ্চতায়, কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের ওপর রয়েছে একটা ক্রেন। সেটার কিছু হয়নি কিন্তু তার দড়িগুলো এলোমেলো বিসদৃশভাবে ওপরে-নীচে পাক খেয়ে আছে। ক্রেনটি ক্যানভাস দিয়ে ভালভাবে বাঁধা ছিল, কিন্তু কি ভাবে তার ভেতর থেকে দড়িগুলো বেরিয়ে এসে ওভাবে জড়িয়ে গেল, ভেবে বিস্মিত হল তথ্যানুসন্ধানী দল।

জনৈক নাবিক ওপরে টিলার ওপর একটি চমকপ্রদ বস্তু আবিষ্কার

করল। একটা যন্ত্রের বাক্স। অর্থাৎ, বড় একটা কাঠের বাক্স, যার ভেতরে রয়েছে দড়ি, ক্রেনের স্পেয়ার-পার্টস্, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি। এটা থাকে ক্রেনের কাছে। কি ভাবেই বা এটা ক্রেন থেকে চল্লিশ ফিট আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একশো দশ ফিট ওপরে টিলার গর্তে গেল—সে এক রহস্য। মুর পরীক্ষা করে দেখল যে ক্রেনে যে দড়িগুলি জড়িয়ে আছে, সেগুলি এই বাক্সের ভেতরে থাকা দড়ি। এর একটি মাত্র অর্থই হয় যে, এই লিয়ন মর দ্বীপটির ওপর দিয়ে এমন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে যে, একশো ফুট উঁচু ঢেউয়ের ঝাপটা তার সর্বাঙ্গে লেগেছে।

এটা অবশ্য খুবই দুঃসম্ভব ঘটনা। হতেও বা পারে। এর উপর নির্ভর করে তথ্যানুসন্ধানী দল একটি রিপোর্ট খাড়া করল। সেটা নিম্নরূপ।

পনেরোই ডিসেম্বর এই দ্বীপটিতে এমন একটি সামুদ্রিক ঝড় শুরু হয়েছিল যে, লাইট-হাউসের তিনজন তত্ত্বাবধায়কের বোধকরি মনে হয়েছিল যে ক্রেনটা না ড্যামেজ হয় বা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে জেটিটাকেও চুরমার করে দেয়···ঝড়ের গতি একটু শ্লথ হলে তারা বেরিয়ে পড়ে···পশ্চিম দিকের ল্যাণ্ডিং-এর কাছে যায়···যখন তারা ক্রেনের দড়াদড়ি বাঁধন-ছাদন পরীক্ষা করে দেখছিল সে সময় নিশ্চয়ই প্রলয়ঙ্কর এক তুফান ও আকাশছোঁয়া ঢেউ এসে আচমকা তাদের গ্রাস করে ফেলে এবং ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়।··

—কিন্তু পনেরো তারিখে তো কোন ঝড় ছিল না সমুদ্রে, সঙ্গের নাবিকদল প্রতিবাদ করে।

বেশ, তাহলে ঘটনা ঘটেছে ষোল তারিখে। সেদিন ঝড় ছিল। কিন্তু ডুকাটের রেকর্ডে শেষ লেখা যে ১৫ই তারিখ বেলা ন'টা? সেটা হয়তো ডুকাট ভুল লিখতে পারে।

কিন্তু সব কিছুই জোর করে যেন কল্পনা করা হল। তাহলে ঐ

ঝড়ের মধ্যে ডোনাল্ড ম্যাকআর্থার সি-বুট এবং রেন-কোট না নিয়েই গিয়েছিল কেন? তার ওগুলো যে ঘরেই পাওয়া গেছে।

তা হোক, এ-ছাড়া আর কি সম্ভাব্য রিপোর্টই বা দেওয়া যায়? কিন্তু এ রিপোর্টও তারা দাখিল করতে পারল না। কারণ লচ-রাওগ বন্দরে ফিরে এসে দেখা হল 'আচার' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন হলম্যানের সঙ্গে। তার মুখে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাতে অনুসন্ধানকারী দলের প্রাথমিক রিপোর্ট মিথ্যা হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন জানাল যে, তার জাহাজ ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে ১৫।১৬ তারিখ মধ্যরাত্রে গিয়েছে। তখন থেকেই লাইট-হাউসে আলো জ্বলছিল না।...

তাহলে দুর্ঘটনা ১৫ তারিখেই ঘটেছে। সেদিন তো তেমন উল্লেখযোগ্য ঝড় দূরের কথা, প্রবল বাতাসও ছিল না। তাহলে?

তাছাড়া যারা লাইট-হাউস কর্মীদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তারা প্রত্যেকেই জানে যে, ঝড়ের ভেতর কখনই একসঙ্গে তিনজন ল্যাণ্ডিং-এর দিকে যেত না। নিয়ম-অনুসারে যাওয়া উচিত নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় একসঙ্গেই গিয়েছিল, তাহলে ঐ শান্ত আবহাওয়ায় একজন সমুদ্রে পড়ে গেল সহসা? অপর দুজন কি তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলে?

এ সিদ্ধান্তও দাঁড়াল না। কারণ ক্রেনের আশ-পাশ প্রচুর দড়িদড়া ও লাইফবেল্টে ভর্তি—এটা অবিশ্বাস্য কথা যে, সেগুলো ফেলে না দিয়ে দুটো জলজ্যান্ত সুস্থ মস্তিষ্কের লোক চল্লিশ ফিট নীচে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে।

যদি ধরা যায় জলে পড়ে লোকটি জখম বা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল? তাহলেও দুজন সহকর্মী একসঙ্গে লাফিয়ে পড়বে? স্বাভাবিক নিয়মে একজন অবশ্যই ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

মোটমাট কোন বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তই খাড়া করা যায়নি ঘটনার স্বপক্ষে। বিগত ষাট বছর ধরে নানারকম কথাই উঠেছে। একটি হল : তিনজনের একজন সহসা পাগল হয়ে যায়। অতঃপর সে দুজন সহকর্মীকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়। কিন্তু এর স্বপক্ষে বিন্দুমাত্র সূত্র পাওয়া যায়নি সেই দ্বীপে।

কেন না, প্রথমত সন্ধানকারীরা ঐ দ্বীপে বা লাইট-হাউসের বাইরে কি ভেতরে ধস্তাধস্তি-মারামারির কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি। একটি মানুষের পক্ষে—হোক না সে দুর্দান্ত উন্মাদ—দুজন জোয়ান মর্দকে বিনা ধস্তাধস্তিতে গুম করে ফেলা কখনই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সহসা উন্মাদ হয়ে যাওয়া কোন লোক যদি মারমুখী হয়ে ওঠে তাহলে সে হাতের কাছে যে অস্ত্র পায় তাই নিয়েই তাড়া করে, কিন্তু লাইট-হাউসের কুড়ুল, খন্তা, শাবল, কাটারী, ছুরি প্রভৃতি শতাবধি ধারালো অস্ত্রের কোনটাই নিরুদ্দিষ্ট হয়নি। সবই যথাযথ ও যথাস্থানে সাজানো রয়েছে।

এক হতে পারত যে, সে ভুলিয়ে দুই বন্ধুকে টিলার শিখরে নিয়ে গেছে, তারপর তাদের ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। ঝড়ের মধ্যে হলে সেটা সম্ভব। কিন্তু পাগলের পক্ষে লোক ভুলিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে লাইট-হাউসের লোকেরা ঝড়-বাদলে একসঙ্গে কখনোই বিপজ্জনক টিলা বা টিলা শীর্ষের ধারে-কাছেও যায় না।

অবশ্য প্রমাণ হয়েছে সেদিন ঝড় ছিল না। যদি সে কোন অজুহাতে বন্ধুদের টিলা-শিখরে নিয়েও গিয়ে থাকে—কিন্তু দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে গেলে তাদের একেবারে ধারে নিয়ে যেতে হয়েছে এবং সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করাতে হয়েছে। নরঘাতীর পক্ষে এতটা সুশৃঙ্খল কাজ ধীর মস্তিষ্কে করবার ধৈর্য আদৌ থাকে না।

এ-ঘটনা নিয়ে বহু পুস্তক রচিত হয়েছে কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি বিন্দুমাত্র। প্রকৃত ব্যাপার যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আজও সেই লাইট-হাউসটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাবিকেরা সভয়ে স্মরণ করে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে যাওয়া তিনজন মানুষের কথা।

ও অঞ্চলে এটা প্রবাদ গল্পে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এক মুখ থেকে আরেক মুখে গিয়ে কিছু কিছু কাহিনী অতিরঞ্জিতও হয়েছে। এই ধরনের একটি কাহিনী বলে যে যখন মুর প্রথম গিয়ে দুহাতের তেলো মুখে এনে সহকর্মীদের নাম ধরে চিৎকার করে প্রথম ডাক দিয়েছিল, ঠিক সে সময়েই নাকি তিনটি বিশালকায় কালো রঙের অদ্ভুত পাখী লাইট-হাউসের চূড়া থেকে বিকট আর্ত চিৎকার করতে করতে উড়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। ও ধরনের অদ্ভুত পাখী নাকি ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি; বিশেষ করে ঐ অলৌকিক দ্বীপটিতে। এরাই কি তাহলে সহকর্মীদের প্রেতাত্মা?

সুতরাং বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন সদুত্তর নেই। এক অলৌকিক অজ্ঞাত রহস্যে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি?

ঘাতক ডাকিনী ভাড়া পাওয়া যায়

শুনলে তাজ্জব লাগে যে এইসব শয়তানের দূত উইচ্ বা ডাকিনীদের ভাড়া করা যায় মানুষকে মেরে ফেলবার জন্য।

নর করোটি, সর্প, জড়িবুটি আর অদ্ভুত সব শেকড়বাকড়, শুকনো মাকড়সা এবং মারণ-উচাটন, বশীকরণ মন্ত্রের এই উপাসকরা এমনকি 'প্রক্সির' দ্বারাও মানুষের প্রাণহরণে সক্ষম।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক কাহিনী :

আটান্ন বছর বয়সী মেরী স্প্রিংগারের স্বাস্থ্য দেখলে যুবতীদেরও হিংসা হয়।

কিন্তু এমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী মহিলাও মরণোন্মুখ হয়ে শেষ শয্যা নিয়েছেন। বাঁচবার কোন আশা নেই তার।

লস এঞ্জেলেস-এর বাঘা বাঘা ডাক্তারদের ডাকা হয়েছে এই অভিজাত মহিলার বেল এয়ার এস্টেটে। তাঁরা কিন্তু রোগীণীর দেহে কোন প্রকার অসুখ আবিষ্কার করতে পারেনি।

এদিকে ভদ্রমহিলা মরতে চলেছেন।

মিসেস স্প্রিংগার এমন কি তাঁর মৃত্যুর তারিখ ও ক্ষণটি পর্যন্ত জানেন। তিনি তাঁর বিছানায় থাকা মহামূল্য একটি ডায়েরীর পাতায় '২৫শে জুন ১৯৫৭, বেলা তিনটে' লিখে লাল কালিতে একটি বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

এই ক্যালেণ্ডার অনুসারে তাঁর আয়ু আর পাঁচটি দিন মাত্র বাকি আছে।

এর শুরু তিন সপ্তাহ পূর্বে এক মাথা ধরার মাধ্যমে। পরে তাঁর হাতে পায়ে গলায় প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হতে থাকে। বর্তমানে

তার বুকের অবস্থা নাকি সাংঘাতিক। ক্রমশ তা যেন জমে পাথর হয়ে আসছে। একেবারে স্তব্ধ হতে আর বাকি নেই।

প্রথমে মহিলাটি তাঁর এই অসুস্থতার কথা এমন কি তাঁর স্বামী এডওয়ার্ড স্প্রিংগার-এর কাছেও প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছেন। তাঁকে হুশিয়ারী করে দেওয়া হয়েছিল যদি তিনি এ রোগ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন তো তাঁর মৃত্যু হবে অবধারিত। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বামীকে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশদভাবে না বলে পারেন নি।

তিনি খুন বা খতম হতে চলেছেন এমন একজন নারীর দ্বারা যার সঙ্গে তার কোন কালে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। সেই নারীটি ধীরে ধীরে মহিলাকে শেষ করে আনছে এই মহিলার কাল্পনিক মূর্তিসাদৃশ্যে তৈরী একটি পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে। মহিলাটি নাকি অভিশপ্তা হয়েছেন, অভিশাপ কুড়িয়েছেন।

প্রথমে তার পরিচারিকা অ্যালিস যখন এই উইচ্ বা ডাকিনীঘটিত ব্যাপারটি বলে, তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন··· পাগল নাকি ঝি-টা। কিন্তু এটা কোন হাসি তামাসা নয়, নয় কোন পাগলামী। সত্যি সত্যি মারণ-উচাটন মন্ত্রে তার বিভিন্ন অঙ্গ ব্যথা বেদনায় সাংঘাতিক অবস্থায় নেমে আসছে, ঠিক যেমনটি হবে বলে পরিচারিকা অ্যালিস ভবিষ্যৎবাণী করেছিল।

এডওয়ার্ড স্প্রিংগার তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানালেন ঘটনাটা। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু করণীয় নেই। তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে·অবৈধ বা ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগে কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। আর বিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় এমন কোন আইন চলতি নেই যার দ্বারা কোন উইচক্র্যাফট ডল বা ডাকিনী বিদ্যার পুতুল তৈরীর অপরাধে কাউকে অভিযুক্ত করা যায়। পুলিশরা তাঁকে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যেতে উপদেশ দিল।

স্প্রিংগার চলে গেলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হ্যারি অষ্ট্রফের কাছে।

পরদিনই তার তদন্তকারী সহকারীরা বের করে ফেলল সেই উইচ্ বা ডাকিনীকে। বয়স্কা স্ত্রীলোকটি বাঙ্কার হিল-এ একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করে। তাঁর কাছ থেকে তথাকথিত পুতুলটি আদায় করতে এজেন্টদের নগদ তিন হাজার ডলার দিতে হয়েছে ডাকিনীকে।

কাঁচা হাতের তৈরী, খড় দিয়ে বানানো পুতুল, তার মাথায় আঠা দিয়ে সাদা চুল লাগানো, চোখ করা হয়েছে দুটি নীল রঙের বোতাম দিয়ে। পুতুলের গলায়, পায়ে ও হাতে তিনটি পেতলের পিন গেঁথে রাখা হয়েছে। বুকটা বাধা একটা সাদা টোয়াইন সুতো দিয়ে। তবে ঐ তিন হাজার ডলার দেওয়া বুঝি কোনমতেই অসার্থক হয়নি। কেননা যে মুহূর্তে ঐ পুতুলটাকে ধ্বংস করে ফেলা হল সেই মুহূর্ত থেকেই মিসেস স্প্রিংগারের সারা শরীরের ব্যথা বেদনা নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল, তিনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জেরা করে জানল যে, এই ডাকিনীকে ভাড়া করেছে মিঃ স্প্রিংগার এর প্রথমা স্ত্রী। প্রায় পাঁচ বছর ধরে নাকি সেই স্ত্রী এই মিসেস স্প্রিংগারের প্রতি চরম আক্রোশ পোষণ করে আসছিল।

এই অভিজাত ভদ্রমহিলার মৃত্যু হত অবধারিত যদি ডিটেকটিভের সহকারীরা ঐ ডাকিনী পুতুলকে যথা সময়ে হস্তগত করতে অসমর্থ হত।

ডাকিনী তত্ত্ব আজও চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। মারণ-উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি ক্রিয়া বিভিন্ন নামে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে আধুনিক যুগেও।

শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন মানুষ নির্বিশেষে আমরা যতদিন কুসংস্কারে বিশ্বাসী থাকব ততদিন এই ডাকিনীরা আমাদের নানাভাবে হয়রানি করবেই করবে।

পশ্চিম জার্মানীতে আইন হয়ে গেছে উইচ্‌দের ধরবার জন্য। স্যাকসনি ও ব্যাভিরিয়ায় এদের জ্বালায় বহু মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

নিউ অর্লিয়ন্সে পুলিস সংবাদ পেয়েছে যে শহরের মধ্যেই ডজন-খানেক উইচ্‌ চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। ফলে বেশ কিছু লোকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের কাছে বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ এসেছে যে ডেভনশায়ারে একজন লোকের মৃত্যু হয়েছে জনৈক ডাকিনীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে। ইংলিশ মিডল্যাণ্ড-এ ডাকিনীতন্ত্র পশার জমিয়েছে এবং তারা রেগুলার সভা সমিতি করে যাচ্ছে, এরকম একটি সংবাদ পেয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সানফ্রান্সিসকোর একটি দোকান উইচ্‌ক্র্যাফট সংক্রান্ত কতগুলি আজগুবি বস্তু —যথা বাঁদরের লেজ, ব্যাং-এর চোখ এবং বেড়ালের লিভার বিক্রি করে থাকে। বোঝা যায় এর পেছনে ডাকিনীরা বর্তমান।

রাশিয়ার পাড়া-গাঁ অঞ্চলে এখনো ডাকিনীতন্ত্র তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট নিউজ এজেন্সী।

এরিজোনায় জোসেফ শটগান দিয়ে ৪১ বছর বয়স্কা একজন রেড ইণ্ডিয়ান রমণীকে হত্যা করার অপরাধে জেল খেটে যাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি ছিল ডাইনী, সে মারণ উচাটন মন্ত্রে ওর স্ত্রীকে প্রায় প্রাণে মারবার দাখিল করে তুলেছিল। অন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্ত্রী। ডাক্তাররা

কোন কিছুই করতে পারেনি। মজা এই, ডাইনী স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করবার অব্যবহিত পরেই জোসেফের স্ত্রী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

ভারতে তো কথাই নেই। লক্ষ লক্ষ গ্রামাঞ্চলে শত সহস্র ডাকিনী তাদের শিকারদের ঘায়েল করে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় সিডনীর পুলিস সম্প্রতি কিংগস ক্রশ ডিস্ট্রিকট-এ ডাকিনী সমিতি গড়ে তোলবার অপরাধে ৩৮ বছর বয়স্কা একটি রমণীকে গ্রেপ্তার করেছে।

কালিফোর্নিয়ায় ১৩ জন অতি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ফিলিপেনের কৃষক কর্মীর মৃত্যু নিয়ে হেলথ ডিপার্টমেণ্ট একটি তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যেকটি কৃষকেরই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে মৃত্যু হয়। তাদের বেঁচে থাকা সঙ্গীরা জানায় যে ঐ মৃত্যু স্বপ্ন সাধিত হয়েছে ভূতুড়ে অভিশাপে।

যুগোশ্লাভিয়ায় সম্প্রতি ব্ল্যাক আর্ট উপাসক ৯০ জনকে নানা প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

হনোলুলুতে প্রতি বছর বহু হাওয়াইয়ান নেটিভ মারা যায়। ওদের ভাষায় ব্যাঙ উটট-এ, ডাকিনী মন্ত্রকে ওরা এ নামেই অভিহিত করে। শব ব্যবচ্ছেদে মৃতদের শরীরে কোন প্রকার রোগ পায় না ডাক্তারেরা।

এখন কথা হচ্ছে, এইসব ভয়াবহ ডাকিনী মন্ত্র বা অভিশাপ কিভাবে কার্যকরী হয়? ডাকিনীরা কি অলৌকিক কোন ক্ষমতার অধিকারী? না কি মনোবিজ্ঞানের কলা-কৌশলেই তারা তাদের কাজ হাসিল করে থাকে?

তাহলে মারণ উচাটন বশীকরণ ও যাবতীয় বাণ-মারা ইত্যাদি অনিষ্টকরণের নায়কদের ও তাদের আদর্শ কতকালের প্রাচীন তা বিচার করে দেখা যাক।

কথিত আছে প্রায় ৩০০০ বছর আগে থেকেই ঈজিপ্টে

উইচক্র্যাফট পুতুলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আর কালো যাদু বিস্তৃতভাবে চালু ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। মধ্য যুগে ইয়োরোপের সর্বত্র শয়তানের উপাসক দলের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল যারা প্রাচীন উইচক্র্যাফট ঘটিত উদ্ভট সব তন্ত্র-মন্ত্রের উপাসনা করত।

ডাকিনীতন্ত্রের গোপন কথা ও জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত শয়তানের কাছে নিজ নিজ আত্মাকে সম্প্রদান করবার অপরাধে অভিযুক্ত প্রায় ৩ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে চরম দণ্ড দিয়ে হত্যা করেছিল মধ্যযুগীয় সরকারী কর্তৃপক্ষরা। অবশ্য এই সন্ত্রাসের রাজত্বেও ডাকিনীপ্রথা আদৌ বিলুপ্ত হয়নি। ব্ল্যাক আর্ট বা উইচক্র্যাফটের মৃত্যু হয়নি।

আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও বেশ দাপটের সঙ্গেই ডাকিনীরা তাদের কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের উপর অবর্ণনীয় ত্রাসের সৃষ্টি করে। হিংস্রভাবের উদ্রেক করে আজও উইচ, উইচ ডাক্তার, বা মনোবিদ এই ডাকিনী তন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ কাজ হাসিল করে যাচ্ছে। এরা সবাই বহাল তবিয়তে নিরীহ নানা ভয়ে ভীত নরনারীর ওপর তাদের কু-প্রভাবকে খাটিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পয়সা লুটে খাচ্ছে।

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার উইচক্র্যাফেব উপাসক দলের একমাত্র গুরু ছিল অ্যালেস্টার ক্রোলে। ১৮৭৫-এর ইংল্যাণ্ডে ক্রোলের জন্ম হয়। তাঁর জীবনীকারদের মতে ক্রোলের আধ-পাগল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাতা তাঁকে সর্বদা দিনের পর দিন বুঝিয়ে এসেছে যে ক্রোলে হল শয়তানের সন্তান—বুক অফ রিভিলেশনে যেমনভাবে অঙ্কিত আছে ঠিক সেই রকমের অবৈধ জন্তু সে। দুষ্টু ছেলের সামান্য দুষ্টুমীকেও সেই মাতাঠাকুরাণী শয়তানের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ বলে অভিহিত করত। ফলে শুনতে শুনতে ক্রোলের নিজেরও ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে সে সত্যি সত্যিই ডেভিলের সগোত্র।

কেমব্রিজে পড়বার মুখেই সে মধ্যযুগীয় স্যাটানিজম সম্পর্কে

দারুণ পড়াশোনা করে। বিশ বছর বয়সে সে নতুন এক উপাধি গ্রহণ করে নিজ নামের সঙ্গে—'দি বিস্ট ৬৬৬' (স্যাটানিস্টদের নিকট অতি পবিত্র সংখ্যা হল ৬৬৬)। এর পরই নিজ জীবন উৎসর্গ করে ব্ল্যাক ম্যাজিক কালটের সংগঠন কার্যে।

এই কালো বিদ্যা আহরণের জন্যে সে কলেজ পরিত্যাগ করে মিশর ও তিব্বতের প্রাচীন মন্দির ও মঠে মঠে ঘুরে বেড়ায়। নিজেই এক নতুন ধরনের উইচক্র্যাফট উদ্ভাবন করে শিষ্য সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। ফ্রান্স, সিসিলি, গ্রীণউইচ ভিলেজ প্রভৃতি থেকে ভক্তবৃন্দ জুটে যায়।

শোনা যায় ডাকিনী বিদ্যার এই মহাগুরুটি বহু রকমের বিকৃত কাজের অজস্র পদ্ধতি এবং হেরোয়িন নামক মাদক দ্রব্যের অহেতুক ব্যবহার উদ্ভাবন করে।

এই ক্রোলের মৃত্যু হয় বাহাত্তর বৎসর বয়সে, ১৯৪৭-এ। ব্রিটিশ সংবাদপত্র তাকে রাজকীয় উপাধি দিয়েছিল—'দি কিং অফ ডিপ্রাভিটি' বা চরিত্রভ্রষ্ট নৃপতি।

ক্রোলের শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপের খুব সামান্য কিছুই আমাদের গোচরে আসে। কেননা এরা নিয়তই সবকিছু গুপ্তভাবে গোপনে করে থাকে। আজও তাই। তবে বহু চেষ্টা ও ধৈর্য সহকারে অধ্যবসায় চালিয়ে গেলে এদের অদ্ভুত কার্যকলাপের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না এমন নয়।

প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে ব্ল্যাক সমাবেশ হত দুপুর রাতে জঙ্গলের মধ্যে। সামনে বসে থাকতো বীভৎস মুখোশধারী পুরোহিত, আর ভক্তেরা উলঙ্গ অবস্থায় নেচে যেত একটি প্রজ্জ্বলিত গনগনে আগুনকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে। টাম্বুরিন ও ড্রাম বাজতো ভূতুড়ে আওয়াজে: অনুষ্ঠান শেষ হত সব সময়েই এক ধরণের উন্মত্ত হৈ হুল্লোড়ে।

আধুনিক ব্ল্যাক সমাবেশ হয়ে থাকে কোন ব্যক্তিগত বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টের কোন আধো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রায়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্রিয়াকলাপের জগাখিচুরী এই তন্ত্রসমাবেশ। প্রাচীন মতে ল্যাটিন মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারিত হয় প্রথমে। একটি বেড়াল, মুর্গী বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা করে তার রক্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পান করে ভক্তরা। আধুনিক প্রক্রিয়া হল একটি ধর্মসঙ্গীত যার নাম, হিমন টু প্যান। এটি রচিত হয় ক্রোলের দ্বারা, গ্রীক দেবতার দেহ পরিত্যাগের ভিত্তিতে।

গানটি হল :

Come, oh come!
I am numb with the lonely
lust of devildom
Come with flute and come
with pipe!
Am I not ripe?
The Great beast come; go pan!

মধ্যযুগে বহু মনোরোগী ছিল যারা ডাকিনীদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বনেবাদাড়ে ওয়ার-উলভ এবং নির্জন অলিতে গলিতে ভ্যাম্পায়ার হয়ে শিকার খুঁজত এবং তাদের রক্তপান করে বেড়াত।

আধুনিক যুগে এই সেদিনও যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা গেল আমেরিকাতে, তাতে বোঝা যায় যে এই ব্ল্যাক আর্টের আকর্ষণ আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু কিছু মানুষের মধ্যে ভয়ালভাবে বিদ্যমান। দক্ষিণ জার্সির একটি শান্তশিষ্ট গ্রামের অধিবাসী ৪৭ বছরের এক ফার্ম শ্রমিক স্বীকারোক্তিতে জানায় যে সে ১৩ বছরের একটি কিশোরকে গলা টিপে হত্যা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তার করোটিকে

গুঁড়ো করে এমন একটি মলম তৈরী করবে যার সাহায্যে প্রেমপ্রণয় ও পুরুষত্বহীনতায় মহা উপকার পাওয়া যাবে। জুয়ান বিভেরা আপস্তে নামক হত্যাকারী স্বীকার করেছে যে ব্ল্যাক ম্যাজিক প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করে সে এ কাজে প্রলুব্ধ হয়েছে। নারী বশীকরণ করবার প্রকৃষ্ট উপায়।

সে কিশোরটির মৃতদেহ সাত মাস কাল কবর দিয়ে রাখে। তারপর শুধু মুণ্ডুটিকে বের করে এনে একটা কেরোসিনের স্টোভের উপরে ঝুলিয়ে রাখে শুকোবার অভিপ্রায়ে। পরে করোটি ভাজা ভাজা হলে তাকে গুড়ো পাউডারে পরিণত করে নারী বশীকরণের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু পুলিস যখন আসে তখনও করোটিটি স্টোভের ওপরেই ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

আমেরিকার সমস্ত প্রধান প্রধান নগরেই দেখা যায় একদল স্ত্রীলোক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তাদের যাদুকর হিসাবে পরিচয় দেয়। আমাদের দেশের ভবঘুরে ইরাণী স্ত্রীলোকদের মত। ঐসব স্ত্রীলোকেরা বিশেষ করে যে বাড়ীতে প্রৌঢ়া বা অতি বৃদ্ধা নারী রয়েছে বা অসুস্থা কোন মহিলা রয়েছে সে-রকম স্থান বেছে নেয়। তারপর রোগ সারানোর অলৌকিক ডাকিনী বিদ্যার পঞ্চমুখ প্রশংসান্তে তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ নিয়ে সরে পড়ে। যে বাড়ীতে যত কুসংস্কার সে বাড়িই ওদের পক্ষে তত সুবিধেজনক।

আজকের বিশ্বে দু-ধরনের উইচ ডাক্তার বা ডাকিনী চিকিৎসক তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একদল ডাক্তার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান বা যে কোন উপজাতীয় চীফদের প্রজাপুঞ্জের ওপর কর্তৃত্ব রক্ষা করায় সাহায্য করে তাদের আপাত-অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখিয়ে, আকাশে বাতাসে দানবীয় প্রেতাত্মার আনাগোনায় বিশ্বাস করিয়ে এবং এ ব্যাপারে ঐ ডাকিনী ওস্তাদই যে একমাত্র ত্রাণকর্তা এ কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ে। অনেকে বৈজ্ঞানিক

আবহাওয়া ভবিষ্যৎবাণীটি পূর্বাহ্নে জেনে নিয়ে তারপর আদিম অধিবাসীদের একটি বৃষ্টি নৃত্য করায় মন্ত্র পাঠ করিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণীমত বৃষ্টি নেমে আসে, আর তার হয় অবিশ্বাস্য রকম যশ। ভক্তিতে নুয়ে পড়ে অসভ্যরা। শহরে বন্দরে যে উইচ ডাক্তাররা বসবাস করে তাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কণ্ট্রোল নয়, স্রেফ টাকা রোজগার করা।

ভুয়া জরিবুটি মন্ত্রতন্ত্রে যদি রোগী সারে তো বাহবা পেল। না সারলে দোষ দিল রোগীর, সে নিশ্চয়ই নির্দেশ যথাযথ পালন করে নি। পুলিসের চোখ এড়িয়ে যাবার জন্য সে তার রোগীদের চরম সর্বনাশ হবার ভয় দেখিয়ে এবং প্রেতাত্মাদের অশুভ দৃষ্টির আতঙ্ক শুনিয়ে চুপ করিয়ে রাখে। তাই শতকরা নিরানব্বই ভাগই ঠকলেও পুলিসে যায় না।

এই ডাকিনী বিদ্যায় হিপনোটিজম-এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। দক্ষ হিপনোটেন্ট পাওয়ার অফ সাজেসশান ব্যবহার করে বেদনার তাৎক্ষণিক উপশম, কিংবা সাইকোমেটিক (কাল্পনিক) প্যারালিসিস বা হিস্টিরিয়া প্রভৃতি নিরাময় করতে পারে। আবার হিপনোটিজম্-এর বলে চরম বেদনার অনুভূতি, পক্ষাঘাত এবং অন্ধত্ব এনে দিতে পারে।

পূর্বোক্ত হাওয়াইযান এবং ফিলিপাইনের কৃষকদের ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মৃত্যুও এই একই প্রক্রিয়ায় পোস্ট হিপনোটিক সাজেশানের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।

ডাকিনীরা স্টেজের যাদুকরদের মত লোক ডেকে সম্মোহিত করাবার সুযোগ কম পায়। তাই তারা দূর থেকে রিমোট কণ্ট্রোলের সাহায্য নেয়। দু-রকমে এ সাহায্য কার্যকরী হয়, এর একটি সহকারী টাউট আর দ্বিতীয় হল পার্টির সহজাত কুসংস্কার।

একেবারে গোড়ায় বর্ণিত মিসেস স্প্রিংগারের ক্ষেত্রে ডাকিনীর

টাউট ছিল তাঁর বাড়ির পরিচারিকাটি। ডাকিনী ঝিটিকে পয়সা খাইয়ে হাত করেছিল। সে ঐ গিন্নীকে ডাকিনী অভিশাপ এবং ডাকিনী পুতুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে। তাকে প্যাঁচে ফেলে বলা হয়েছিল মিসেস স্প্রিংগার যে কোন ধরণের অসুখে পড়লেই ডাইনী পুতুলের কথা তাঁর কানে তুলবে এবং মৃত্যুর দিনক্ষণ সব জানিয়ে দেবে।

আসলে ভদ্রমহিলার একদা রৌদ্রে ঘোরাঘুরির ফলে প্রচণ্ড মাথা ধরে। ঝিটি ঠিক এ সময়েই ঝোপ বুঝে কোপ দেয়। পর পর একই ডাকিনী অভিশাপের কথা বলাতে ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হয়ে শয্যা নেন।

যথাকালে এই ঝিটিই ঐ ডাকিনী পুতুলটিকে এনে দেখাতো গিন্নীকে। পুতুলের বুকে এফোঁড় ওফোঁড় একটি পিন ফোটানো থাকতো। আধ মরা গিন্নী নিদারুণ মরণ আতঙ্কে হার্টফেল করে মারা যেত। নিখুঁত একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে যেত এই কৌশলে।

কিন্তু হল না। তৎপূর্বেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ অষ্ট্রফ-এর সহকারীরা গিয়ে ডাকিনী এবং তার পুতুলকে ধরে ফেলল। সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলা অকালে প্রাণহারানো থেকে বেঁচে গেল।

উইচক্রাফটের ব্যবসা চলে মানুষের চরম কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে। যারা অশুভ ভূত প্রেত ডাকিনী-যোগিনী ডেভিল বা শয়তানে বিশ্বাস করে তারাই প্রধানত এদের খপ্পরে পড়ে।

কুসংস্কার কমেনি, কমবে না। তাই ডাকিনী বিদ্যার প্রভাবও দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে দুনিয়ায়।

কাহিনী স্থল দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাকেন্সবার্গ পাহাড়ের তড়াই অঞ্চলের একটি স্থান।

সেখানে একটি ঘোড়ায় চড়া শিক্ষার স্কুল খুলেছিল এক জার্মান দম্পতি। স্বামীর নাম হেলমুট আর স্ত্রীর নাম ইরমা।

দুজনেরই তবু বিশেষ করে স্ত্রী ইরমার ঘোড়ারাই হল ধ্যান জ্ঞান। জাগরণে নিদ্রায় স্বপ্নে বাস্তবে ঘোড়া ছাড়া কোন কথা নেই, ঘোড়া ছাড় কোন চিন্তা নেই। দুজনেই ঘোড়াদের প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। দুজনেই ঘোটক বিশেষজ্ঞও বটে।

স্ত্রী ইরমার চেহারাটি দেখবার মত। লম্বায় পাক্কা ছয় ফুট। নীল চোখ, একমাথা বাদামী চুল। মেয়ে হলেও পুরুষালি ভাব ওর দেহে বড়ই প্রকট। কোন কিছুকেই সে ভয় পায় না, কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না। শরীরে শক্তিও আছে প্রচুর। পরণে সার্ট ও ব্রিচেস। অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়ার পোষাক।

স্বামী হেলমুট আর পাঁচজনের মতই সাধারণ চেহারার মানুষ। দুজনেই অসাধারণ অশ্বারোহী। ঘোড়ায় চড়া ট্রেনিং দিতেও খুব পারদর্শী। ঐ অঞ্চলে ওদের এই ট্রেনিং স্কুলের খুবই নাম।

একদিন ইরমা তার এক বান্ধবীর কাছ থেকে এক জরুরী পত্র পেল, পত্রে লিখেছে তার হেপাজতে একটি সাংঘাতিক পাগলা ঘোড়া রয়েছে। দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু স্বভাব ও চরিত্র অতীব জঘন্য। অস্বাভাবিক বদরাগী ঘোড়া। কথায় কথায় কান ফাটা চিৎকার আর যখন তখন যাকে তাকে কামড়ে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে সে অনেক কেলেঙ্কারী করেছে।

একজন আস্তাবল বয়-কে মেরে ফেলেছে। আর পথে হত্যা করেছে অনৈক ব্যক্তিকে।

দু-একজনকে বিক্রি করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই সব হবু ক্রেতাদের প্রায় আধমরা করে জখম করেছে।

নিদারুণ হিংস্র স্বভাবের এই জানোয়ার। জাতীয় ঘোড়া। অনুমান হয় অবশ্যই ইতিপূর্বে কোন মানুষের দ্বারা সে জঘন্য ব্যবহার পেয়েছে বা পাশবিক নির্যাতন ভোগ করেছে। যার ফলে সে মানুষের ওপর এতটা ক্ষ্যাপা হয়ে গেছে।

এসব জানিয়ে বান্ধবীটি মন্তব্য করেছে :

আমি পড়েছি উভয় সংকটে। একে গুলি করে এক মুহূর্তে খতম করে দেওয়া যায়। কিন্তু জানো ভাই ঐ ধরনের নিষ্ঠুর কাজ করতে আমার হাত ওঠে না।

তাই তোমাকে এই পত্র লিখছি। আমি জানি তুমি অসাধারণ ঘোড়া প্রেমিক।

যদি চাও, এই ঘোড়াটাকে আমি তোমায় দিয়ে দিতে পারি। মূল্য হিসেবে এক পেনিও তোমাকে দিতে হবে না। বলতে পার নিঃশর্ত উপহার এটা।

তুমি পত্রোত্তরে অবিলম্বে জানাও তুমি এ প্রস্তাবে রাজি আছ কিনা।

রাজি থাকলে আমি অচিরেই ঘোড়াটিকে তোমার ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

শুনে, স্থানীয় অনেকেই নিষেধ করলো। না না, খেঁকুড়ে বদমাইশ, বদমেজাজী খুনে একটা জানোয়ার। তাকে কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। লিখে দাও বান্ধবী যেন ওটাকে শেষ করে দেবার ব্যবস্থাই করে। নয়ত আরও কতো মানুষ মেরে ফেলবে ও তার ইয়ত্তা নেই।

এসব কোন কথা কানে তুলল না ইরমা। গ্রাহ্য করল না সদুপদেশ। বান্ধবীকে পত্র লিখে দিল সে যেন ঘোড়াটাকে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

* * *

ক'দিন বাদেই সেই কুখ্যাত খুনে ঘোড়াটি এসে পৌঁছলো ইরমাদের নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশানে।

ওরা গাড়ি ঘোড়া লোক নস্কর নিয়ে ওয়াগন থেকে ডেলিভারী নিতে রওনা হয়ে গেল।

গিয়ে দেখলো, চেহারাটি প্রকৃতই দেখবার মত। খুবই সুন্দর। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। সারা অঙ্গ সোনামাখা বাদামী রঙ। ঘাড়ের ওপর বাদামী কেশর। বড় বড় দুটি চোখ।

কিন্তু দৃষ্টি এলোমেলো। হিংস্র চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর টগবগ করে যেন ছটফট করছে।

রেলওয়ে ওয়াগনের খাঁচা ভেঙ্গে ফেলবার দাখিল।

কখনো বিকট হ্রেস্বাধ্বনী, কখনো দাঁত খিচুনী। সব মিলিয়ে ভয়ংকর একটা তরতাজা চঞ্চল জানোয়ার।

স্বামী হেলমুট দুজন ভৃত্যসহ এগিয়ে গিয়ে ওয়াগনের খাঁচা থেকে ঘোড়াটিকে বের করে আনতে গেল।

ওদের কাছে আসতে দেখেই ঘোড়া সহসা দাঁড়িয়ে গেল। তার পর সামনের পা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে সামনেকার রেলিং-এ প্রবল আঘাত হানল।

হেলমুট তখন দুজন ভৃত্যকে পাশে সরে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে নিজে একা এগিয়ে গেল। এবার ক্ষ্যাপা ঘোড়াটা আরও বেশি পেছিয়ে গিয়ে, সামনের দুপা তুলে বিকট গর্জন করতে করতে এগিয়ে এসে সামনের রেলি-এ ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ভাবটা যেন ছাড়া পেলেই হেলমুটকে টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে খাবে।

এ ধরনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকল।

অসহ্য ক্রোধে হেলমুটের মুখ লাল হয়ে উঠল, শরীর কাঁপতে লাগলো অপমানে।

পকেট থেকে সে রিভলবার বার করলো। এ ধরনের পাজী জানোয়ারকে শেষ করে দেওয়াই সমীচিন।

বিপদ দেখে স্ত্রী ইরমা এক দৌড়ে এগিয়ে গেল খাঁচার সামনে। স্বামীকে নিষেধ করে সে খাঁচার রেলিং ধরে অতি কোমল এবং মধুর কণ্ঠে জার্মান ভাষায় কি যেন বললো গুনগুনিয়ে।

আর আশ্চর্য, ঘোড়াটার কান খাড়া হয়ে উঠলো তক্ষুনি।

সে অতি শান্তভাবে তাকালো ইরমার পানে।

পাশে দাঁড়ানো ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত স্বামী হেলমুট দেখল ইরমা অকুতোভয়ে স্নেহমাখা চাউনী সহ হিংস্র ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ডান হাত খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো পরমাদরে।

আর অবাক কাণ্ড শান্ত সুবোধ বালকের মত সেই দুরন্ত জীবটা মাথা নিচু করে আদর খেতে লাগলো।

অদ্ভুত দৃশ্য।

দুজনেই বাদামী। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ রমণী, বাদামী চুল তার হাওয়ায় উড়ছে। বাদামাদেহী শক্তিশালী বদমেজাজী জানোয়ার।

দুজনেই কি এক যাদুমন্ত্রে যেন একাত্ম হয়ে গেছে। যেন মানবী মায়ের জানোয়ার ছেলে। দামাল ছেলে।

মুখের লাগাম ধরে, খাঁচার দরজা খুলে, ঘোড়াটাকে বাইরে এনে ইরমা বললে, আমি একে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

—না না না, স্বামী সভয়ে বলে ওঠে, পাগলামি কোরো না।

পথ কিন্তু কম নয়, পুরো ষোল মাইল। তুমি বরং গাড়িতে যাও, আমিই চালিয়ে নিয়ে যাই ঘোড়াটাকে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ইরমা বলে ওঠে, কি বললে? তুমি নেবে? বেশ, চেষ্টা করে ছাখো।

হেলমুট কাছে যেতে ফের সেই ভয়াবহ ও বিরক্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হল।

সেই দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘোড়াটা বিকট চিৎকার করে যেন দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো।

স্ত্রী বিকৃত হাসি হাসলো। ক্রুদ্ধ হতাশায় পেছিয়ে এল স্বামী।

ইরমা তখন কাছে গিয়ে এক লাফে দুরন্ত ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসলো। তারপর দ্রুত চালিয়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনে হল সর্বশক্তিমতী এক বনদেবী যেন তার উপযুক্ত বাহন নিয়ে অনায়াসে নিজপথে চলে গেল।

খট খট খটা খট ধ্বনী মিলিয়ে যেতে হেলমুট তার মোটরে স্টার্ট দিল।

বিশেষভাবে তৈরী এক আস্তাবলে ঘোড়াটাকে রাখলো ইরমা।

অতঃপর সর্বক্ষণ কি আদর, কি যত্ন, কি মধুর সব কথাবার্তা জার্মান ভাষায় গুণগুণিয়ে শোনাতে লাগলে সে ঘোড়াটাকে।

অবাক কাণ্ড। ঘোড়াটাও লক্ষ্মী ছেলের মত আদর খেতে লাগলো। চোখ বুজে মিটিমিটি চেয়ে।

এ যেন মনিব নয়। এ যেন মা। সে যেন তার কোলের ছেলে।

পরদিন সকালবেলা হেলমুট গিয়ে উপস্থিত হল খুনে ঘোড়ার আস্তাবলে।

ঘোড়াটার কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে যেই সে তাকে নতুন লাগাম ও বলগা পরালে, অমনি নিমেষে সেই পূর্বেকার মত হিংস্র মূর্তি:

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে হেলমুটের কব্জিতে প্রবল এক কামড় বসিয়ে দিল।

—ওহ্ গড! বলে আর্তনাদ করে হেলমুট বেরিয়ে এল তার রক্তাক্ত হাত নিয়ে।

ওদিকে কানফাটা গর্জন করে লাফাতে ঝাঁপাতে লাগলো খুনে ঘোড়াটি।

সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হল ইরমা। চোখে তার কোমল চাউনী, মুখে তার মধুর হাসি।

গুণ গুণ করে বললে, সুপ্রভাত। তারপর এগিয়ে গেল এবং গিয়ে ঘোড়াটার কান দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আদর করতে লাগলো।

এ যেন এক পরশমণি। হিংস্র ঘোড়াটা যাদু স্পর্শে হয়ে গেল শান্ত সুবোধ সুশীল। এখন বুঝি সে মানবী মায়ের কোলের ছেলে। নাক দিয়ে ইরমার হাত ঘষে ঘষে আদর করতে লাগলো সেই দামাল ছেলে।

মনে হতে লাগলো এরা কোন মানবী বা ঘোড়া নয়। এরা পরস্পর পরিচিত বহুদিন ধরে, বহুকাল ধরে, হয়ত জন্মজন্মান্তর থেকেই।

সেদিন থেকে এক নতুন খেলা শুরু হল।

ইরমা ওকে নিয়ে একা একা নির্জনে বন মধ্যে চড়ে বেড়াতে লাগলো। দুজনেই বাদামী রঙের।

কিছুদিনের মধ্যেই ঐ আস্তাবলে, কি শ্বেতাঙ্গ, কি কৃষ্ণাঙ্গ, সব অধিবাসীদের মধ্যেই ইরমা ও তার ঘোড়া কিংবদন্তীর মত আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো।

ওরা বুঝি সারকাসের খেলাকেও হার মানাতে লাগলো।

যেসব বেড়া, প্রাচীর, নালা নর্দমা, ছোট খাটো খাল ইত্যাদি

এতকাল অলঙ্ঘ্য ছিল তা-ও ওরা দুজনে অনায়াসে লাফিয়ে পারাপার হতে লাগলো। আর সে কি দৌড়। অসম্ভব দ্রুততায় পথ অতিক্রম করতে লাগলো।

স্বভাবতঃই এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। স্বামীর দু চোখের বিষ এই বজ্জাত ও হাড় হাবাতে ঘোড়াটাকে নিয়ে স্ত্রীর এই ধরণের বাড়াবাড়িই এই কলহের কারণ।

আর ইরমাও যখন তখন কঠিন বিদ্রূপের স্বরেই বলতো স্বামীকে, একবার চড়বার চেষ্টা করে ছাখো না ওর পিঠে? তুমি তো ঘোড়ার মাস্টার বলে নিজেকে গর্ব করো। একে দিয়ে তা প্রমাণ করো, দেখি।

শুনে হেলমুট অব্যক্ত অসহনীয় ক্রোধে কাঁপতে থাকে, ফুঁসতে থাকে।

সে বুঝি সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল।

একদিন দেখা গেল হেলমুট লাগাম, জিন ইত্যাদি নিয়ে খুনে ঘোড়াটার আস্তাবলের কাছে গেল।

বিস্ময়ের বিষয়, এবার যখন হেলমুট ওকে জিন পরালো, লাগাম লাগালো, সর্বক্ষণ ঘোড়াটা চুপ করে শান্ত ছেলের মত দাঁড়িয়ে রইল। এতটুকু বাধা দিল না বা পাগলামী করল না।

হেলমুট কাল বিলম্ব না করে একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলো।

কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ইরমা, আতঙ্কিত ভীত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, করছ কি, করছ কি! শোন শোন, শিগগির নেমে পড়।

—সাট আপ্। সরে যাও, হেলমুট প্রায় গর্জে উঠলো ক্রোধ ভরে, এবার দেখা যাবে কে ওর মাস্টার। প্রায়ই তুমি টণ্ট্ করে বলো, চড়ে দেখো না, চড়ে দেখো না। তাই চড়ে দেখাচ্ছি। এখন

ভয় পেলে চলবে কেন। সরে যাও। দেখি আমি ওকে বাগ মানাতে পারি কিনা?

আতংকে, ত্রাসে না ক্রোধে কে জানে কিন্তু ইরমার শরীর ভীষণ ভাবে কাঁপছিল তখন।

হেলমুট পায়ের কাঁটাওয়ালা জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকড়ালো। সে আঘাতে চামড়া ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এল ফিনকি দিয়ে।

কিন্তু ঘোড়াটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তেমনি নট নড়ন চড়ন, এক ইঞ্চিও নড়ল না।

আরও রেগে হেলমুট হাতের চাবুক দিয়ে সপাসপ মারতে লাগলো ঘোড়াটার মাথায়, মুখে, চোখে। আর মুখে চিৎকার করে অকথ্য গালাগাল দিতে থাকলো।

কিন্তু তবুও ঘোড়াটা স্থাণুর মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

দেখে শুনে ইরমার চক্ষু স্থির। মানসিক যন্ত্রণায় তার পাগল হবার দাখিল। ইরমা তাই কাঁদো কাঁদো হয়ে এবার বলে ওঠে, ওগো শুনছ! আমি যা বলেছি তা ভুলে যাও। ফরগেট ইট। প্লিজ, ঘোড়া থেকে নেমে এস। ওকে ওরকম কোরো না। ও—ও তোমাকে এর বদলা নেবেই, ও তোমাকে মেরে ফেলবে, প্রাণে মেরে ফেলবে, আমি জানি…।

ইরমার কথা শেষ হল না, অকস্মাৎ ঘোড়াটা নড়ে উঠলো। তারপর অসম্ভব এক লাফ দিয়ে সামনের দিকে অতি দ্রুত গতিতে ছুটে চললো রক্তাক্ত দেহ নিয়ে।

অকারণে চাবুক চালিয়ে যেতে লাগলো হেলমুট।

—চল ব্যাটা চল। বাধ্য না হলে, কথা না শুনলে তোকে আজ প্রাণেই মেরে ফেলবো পাজি নচ্ছার ঘোড়া কোথাকার। এখনো তুই চিনতে পারিস নি আমাকে।

হেলমুট এইভাবে গর্জাতে গর্জাতে সমানে ঘোড়াটাকে মাঠের মধ্যে পাক খাওয়াতে, চাবকাতে ও গালাগাল দিতে লাগলো। এর যেন আর শেষ নেই।

ঘোড়াটার সর্বাঙ্গ ঘামতে লাগলো। পেছনের দেহে রক্ত ঝরছে, মুখে গাজলা দেওয়া ফেণা। হেলমুটের মুখে নিষ্ঠুর বিজয়ীর হাসি।

ইরমাকে সে দেখাতে লাগলো নানা কসরৎ। একবার ঘোড়াটাকে দিয়ে দুপা তুলে স্যালুট পর্যন্ত করালো সে। ইরমা ভীত মুখেই হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

দুর্দান্ত ডাকাত সর্দারের মত ঘোড় সওয়ার হয়ে হেলমুট দিকবিদিকে ছোটাছুটি করে চলেছে।

ইরমা এক জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আশংকায় কাঁপছে।

অকস্মাৎ খুনে ঘোড়াটা একটা অবিশ্বাস্য উচ্চতায় লাফ দিল। সেই আচমকা ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে হেলমুট পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

আর তক্ষুণি শুরু হয়ে গেল ভয়ংকর বীভৎস এক লোমহর্ষক দৃশ্য। এবারে বুঝি ঘোড়ার পালা। ঘোড়ার বদলা নেওয়ার পালা।

ভূলুণ্ঠিত অবস্থা থেকে সবে হেলমুট উঠে দাঁড়িয়েছে। তক্ষুণি প্রবলবেগে ঘোড়াটা ঘুরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

সামনের দুপা তুলে প্রথমে কান ফাটা হ্রেস্বাধ্বনী করে উঠলো সে। তারপর চিৎকারে চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে তুলে অকল্পনীয় ভয়ংকর লাথি চালাতে লাগলো দুপায়ে কর্কশ খুর দিয়ে হেলমুটের সর্বদেহে।

ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মরে পড়ে রইল হেলমুট।

ইতিমধ্যে দেখবার জন্যে চারদিকে ভীড় জমে গিয়েছিল। এ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখে উপস্থিত জনতা ক্ষেপে গেল এর প্রতিশোধ নিতে।

ঘোড়াটা এবার সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। ঘাড়ের বাদামী কেশরগুলো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো ভাবে। চোয়াল বেয়ে রক্ত ঝরছে লাগামের আঘাতে।

জনতার একজন বন্দুক হাতে এগিয়ে গেল, গুলি করে এই ঘাতক ঘোড়াটাকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে।

অকস্মাৎ নিশ্চল হতভম্ব অবস্থা থেকে ইরমা দৌড়ে গেল ঘোড়াটার দিকে।

তেমনি মধুর কোমল কণ্ঠে বলল, চল চল তুমি আমার সঙ্গে।

এই বলে চোখের নিমেষে এক লাফে ঘোড় সওয়ার হয়ে গেল সে। তার বাদামী চুল আর ঘোড়াটার বাদামী কেশর একই সঙ্গে বাতাসে উড়তে লাগলো।

নিচু হয়ে বারেক কেশরে হাত বোলাতে বোলাতে ইরমা সজল চোখে রুদ্ধ কণ্ঠে কি যেন অস্ফুটে বলতে লাগলো। ও কি স্বামীর জন্যে পাগল হয়ে গেল?

তারপর সোজা হয়ে বসে দুপা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল ঘোড়াটার পেটে। উল্কা বেগে ছুটে এগিয়ে চললো ঘোড়া তার সওয়ার ইরমাকে নিয়ে।

—ও কি। ও কি! কোথায় চলেছে ওরা? উপস্থিত জনতা আতঙ্কে দেখলো, ইরমা ঘোড়াটাকে নিয়ে পাহাড়ের চড়াই পথে উঠে গেল শীর্ষে। তারপর সেখান থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে প্রায় দু হাজার ফিট নিচে বনমধ্যে দুজনে পড়ে গেল। তলিয়ে গেল।

মরণ ঝাঁপ দিল দুজনে।

স্বামী স্ত্রী ও খুনে ঘোড়া কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে খতম হয়ে গেল।

মানুষরূপী নেকড়ে

শুনলে অবাক লাগে আজও আফ্রিকার কিছু উপজাতীয়দের মধ্যে এমন সব ধারণা বা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে, যাকে সভ্য মানুষেরা বলে থাকে অন্ধ কুসংস্কার বা স্রেফ আজগুবী ব্যাপার। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে সেগুলি কুসংস্কার বা অলীক কল্পনা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নে বর্ণিত রোমাঞ্চকর, প্রায় অলৌকিক কাহিনীটি পড়লে। এ প্রমাণ পেয়েছে, এসব ব্যাপারে যারা সবচেয়ে অবিশ্বাসী, অর্থাৎ তিনজন সুসভ্য ইংরেজ সন্তান।

জাহাজে চেপে দুজন সাহেব দেশে ফিরছিল। একজনের নাম রাইট, অপরজনের নাম রিচার্ড।

রিচার্ড এক সময় একটা বড় কৌটো বের করে বললে, একটা জিনিষ দেখবে, রাইট ?

—কি জিনিষ ? জানতে চায় রাইট।

রিচার্ড কৌটো খুলে, অতি যত্নে রাখা একটি মোড়কের মধ্যে থেকে যা বের করল, তা হল একটি জন্তুর নিচের চোয়াল। এই দন্ত পংক্তির শেষের দিকে দুটি দাঁত নেই দেখা গেল।

রিচার্ড ফের জিগ্যেস করে, বলতো এটা কি ?

রাইট জবাব দেয়, এটা কোন নেকড়ে বা হায়নার চোয়াল হবে। কোন কুকুর বা শেয়ালের চোয়ালের চেয়ে এটা বেশ বড় দেখা যাচ্ছে। বেশ বলিষ্ঠ ভারী চোয়াল, কুকুরদের মতই লম্বা ধরণের দাঁত। শেষের দিকে দুটো দাঁত নিরুদ্দিষ্ট তাও দেখছি।

—হুঁ, রিচার্ড সহসা একটু গম্ভীর হয়ে যায় বলে, তা ঠিকই। তবে শোন এর বিস্ময়কর ইতিহাস :

এরপর রিচার্ড বলে গেল তার অবিশ্বাস্য কাহিনীটি।

আফ্রিকার উত্তর নাইজেরিয়া তখন সবে ইংরেজদের দখলে এসেছে। রিচার্ড সেখানকার একজন পুলিস অফিসার।

দক্ষিণে বর্নু সীমান্তের দিকে গুডাড়ু জেলা। সেখানে তখন একজন স্থানীয় 'সারিকী' অর্থাৎ রাজা শাসন করতেন। বর্তমানে সেখানে নতুন রাজা হয়েছে। বৃদ্ধ রাজা আলী বিমা-র আজ পাঁচ মাস হল মৃত্যু হয়েছে। অদ্ভুত মৃত্যু! উপরোক্ত চোয়ালটি নাকি তাঁরই!

গুডাড়ু জেলাটি একটি বিচিত্র গোলমেলে জেলা। হাউসাস জাতীয় রাজা হল সেখানকার শাসক নরপতি। প্রজারা হল অর্ধোলঙ্গ পাগান উপজাতীয় মানুষ। এই পাগানদের উপজীবিকা হল শিংবিহীন ভেড়া ও ছাগলের পাল চরানো। এককালে হাউসাস জাতিরা যে ভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালাত তেমনি ভাবে আজও ওদের ভেড়ার পালের উপর প্রায়শঃই অতর্কিতে এসে হানা দেয় হিংস্র হায়নার দল। হাউসাসরা আজও নিজেদের 'কুরা' বা হায়না ভেবে গর্ব অনুভব করে।

আর বিস্ময়ের কথা পাগান প্রজারা এখনও বিশ্বাস করে যে এই হাউসাসদের কোন কোন মানুষ আজও প্রয়োজনবোধে হায়নায় রূপান্তরিত হবার অলৌকিক শক্তি রাখে। তাদের আরও দৃঢ় ধারণা যে হায়না রূপ নিয়ে সেইসব হাউসাস তাদের ভেড়ার পাল আক্রমণ করে কিছু ভেড়াকে নিহত করে। মাঝে মাঝেই দেখা যায় হাটে বাজারে একদল পাগান জনৈক হাউসাসকে 'নর-হায়না' সন্দেহ করে সরবে শাসাচ্ছে। এ কথা শুধু নিরক্ষর অসভ্য পাগানরাই নয় স্থানীয় শিক্ষিত সরকারী আফ্রিকানরাও বিশ্বাস করে।

একদিন অফিসার কমাণ্ডিং ক্যাম্বেল রিচার্ডকে ডেকে উক্ত গুডাড়ু জেলা তদন্তে পাঠিয়ে দিল। খবর এসেছে সেখানে নাকি আইন-বিরুদ্ধ দাস-ব্যবসায় পুনরায় গোপনে শুরু হয়েছে।

তিনজন সাহেব যাবে। পলিটিকাল অফিসার হোমস্, একজন ডাক্তার কস্টেগান ও রিচার্ড। সঙ্গে প্রস্তুত হল সশস্ত্র কুড়িজন আফ্রিকান পুলিস, আর্দালী ও ভৃত্যের দল। প্রায় এক মাসের সফর। সঙ্গে তাঁবু, খাবার, ঘোড়া ও মালবহনের জন্য কিছু টাট্টু, রইল।

যাত্রা শুরু হল।

দিনে পথ চলা। রাত্রিতে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম। আবহাওয়া বিচিত্র। দিনে প্রখর রোদ ও উত্তাপ, আর রাত্রিতে শোঁ-শোঁ-করা পাগলা হাওয়া এবং প্রায় শীতকালের ঠাণ্ডা। স্থানটি যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র আড়াই হাজার ফুট উঁচু।

দিন পাঁচেক পথ চলা হল। এর মধ্যে একটাও শিকার পাওয়া গেল না। শিকার ছাড়া কি জমে! হরিণ, শূয়ার এমন কি একটা খরগোশও চোখে পড়ল না।

একমাত্র যে জানোয়ারগুলির দেখা পাওঁয়া যেতে লাগল তা হল হিংস্র হায়না। ছোট বড় সমস্ত জলাশয়ের ধারেই তাদের পায়ের দাগ দেখা যেতে লাগল।

আর রাত্রিতে ওদের তাঁবুর আশে-পাশে তো দলে দলে সব হায়না দেখা দিতে লাগল।

তাদের বীভৎস চিৎকারধ্বনি বড়ই কর্ণ-পীড়াদায়ক। প্রথমটা একটা বেদনার্ত ক্রন্দন দিয়ে শুরু করে, পরে খটখটে অট্টহাসি দিয়ে শেষ। মনে হয় শয়তানের হাসি। অতীব বিরক্তিকর, অস্বস্তিকর, ভীতিপ্রদ সে চিৎকার। হোমস্ আর রিচার্ডের সে বিকট ডাক গা-সওয়া হলেও ডাক্তার কস্টেগান বড় বিব্রত হত, অসহ্য লাগত তার।

সন্ধ্যার পর থেকেই একটি দুটি করে কাঁধে কুঁজওয়ালা, বিবর্ণ রঙের তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল চোখওয়ালা হায়না এসে ক্রমে ক্রমে বিরাট

দলে পরিণত হয়ে তাঁবুর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিত। সাহেবদের সঙ্গে, খাবার জন্যে কয়েকটি ভেড়া ছিল, নজর তাদের উপরেই। ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে কাঁপতে কাঁপতে ভেড়াগুলি মৃতপ্রায় হয়ে যেত। শক্তিশালী ঘোড়ারাও বিচলিত হয়ে উঠত অজানা ভয়ে।

রাত্রি হয়ে উঠত ভূতুড়ে। হুহু হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ, একটানা অবাস্তব ঝিঁঝিঁর ডাক। তার উপর সহসা শুরু হত প্রথমে কঁকিয়ে কান্না, পরে হায়নার খটখটে অট্টহাসি লোমহর্ষক চিৎকারধ্বনি। চতুর্দিকে গাছপালা-ঘাস-বর্জিত লাল পাথুরে প্রান্তর। তার মধ্যে কুয়াশা-ঘেরা বিশাল এক ঘোলাটে চাঁদ। বেলে বেলে ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় স্থানটা যেন আরও অলৌকিক হয়ে উঠত।

আর ঐ হিংস্র হায়নাদের কি ভীষণ দৃষ্টি! প্রথমটা মনে হবে অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য উজ্জ্বল জোনাকী উড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর চোখ থিতোলে মনে হবে, না ঐ উজ্জ্বল বিন্দু বিন্দু আলোর সঙ্গে ধূসর বর্ণের অসংখ্য মুখ বর্তমান। দিনে এদের পাত্তা থাকে না। রাত্রিতে এরা অনুসরণ করে এসে সুযোগ বুঝে হয়ত একটা ভেড়া নিয়ে নিমেষে ঘোলাটে জ্যোৎস্নার মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়।

সাহেবরা বিরক্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত গুলি করে কিছু মারলও। উদ্দেশ্য ছিল তাহলে ভয় পেয়ে এরা আর বিরক্ত করতে আসবে না। কিন্তু ফল হল বিপরীত। রাত্রির পর রাত্রিতে হায়নার দল যেন বেড়েই যেতে লাগল। পরে কারণটা বোঝা গেল।

আসলে হায়নারা নিজের মাংস নিজেরা খায়। আহত বা মৃত সঙ্গীদের এরা তীক্ষ্ণ দাঁতে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে। তখন যেন খটখটে হাসি আরও বেড়ে যায়। সুতরাং সাহেবদের গুলিতে নিহত স্বজাতীয়দের পেয়ে ওদের বেশ ভাল ভোজই হতে লাগল।

নয়তো এই রুক্ষ লাল পাথুরে প্রান্তরে প্রাণী-বিরল স্থানে প্রাণধারণের মাংস কোথায় পেত।

দলে আফ্রিকান একজন কর্পোরাল ছিল। নাম তার আলী কুসান। তার সামনে একদিন রিচার্ড হায়নাদের 'কুকুর' বলে উল্লেখ করাতে, আলী কুসান সন্ত্রস্ত-ভীত মুখে বললে, কারে, বাতুর, ক্যু মুতানি? অর্থাৎ 'কুকুর' বলছেন স্যার? না ওগুলি কোন মানুষ?

হেসে ওঠাবার মত কথা। তবু সাহেবরা জানে স্থানীয় মানুষদের কোন ধারণা বা বিশ্বাসে হেসে ওঠবার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই।

সহানুভূতির সঙ্গে রিচার্ড প্রশ্ন করে, কি বলতে চাও তুমি আলী কুসান?

আলী কুসান জানায় যে তারা এখন গুডাডু জেলার কাছাকাছি এসে পৌছেছে। আর এই অঞ্চলে মানুষ থেকে হায়নায় রূপান্তরিত হবার অলৌকিক শক্তিধারী বহু মানুষের বাসস্থান। সন্ধ্যের পর সে সব মানুষ হায়নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিশ্বাস না হয় আজ রাত্রেই সে দেখাবে হায়নারা কি রকম মানুষের ভাষা বোঝে।

সে রাত্রিতে যথারীতি তাঁবুর চারদিকে হায়নার দল ঘিরে এল। সাহেবদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আলী কুসান এগিয়ে গেল হায়নাগুলির দিকে, তার নিজ দেশীয় ভাষায় এক মিনিট ধরে কি যেন বলল। আর আশ্চর্য, সমস্ত হায়নার দল বিকট চিৎকারধ্বনি থামিয়ে নীরবে ওর কথাগুলি শুনল।

আলী কুসান থামতেই হায়নারা পুনরায় চিৎকার শুরু করে দিল। দেখে শুনে সাহেবরা বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল।

সাহেবরা জিগ্যেস করলে, কি কথা তুমি ওদের বললে কুসান?

এ দেশীয় একটা পুরানো রসিকতা স্যার! ওরা সেটা বেশ উপভোগও করল।

এর দুদিন বাদে দলটি এসে উপস্থিত হল গুডাড়ু জেলার মাটির দেওয়ালের সন্নিকটে। প্রায় আধমাইলটাক দূরে ওরা তাঁবু গাড়ল।

এদের 'সারিকী' অর্থাৎ রাজা আলী বিমা বেশ কঠোর হাতেই প্রজা শাসন করেন। নানা ঝলমলে পোশাক পরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুলিশদল এসে সাহেবদেব সঙ্গে সৌজন্য-দর্শন দিয়ে গেল। এদের জনৈক সর্দার এ সংবাদ দিয়ে গেল যে রাজা আলী বিমা স্বয়ং এক সময় এসে 'সাহেবদের' সেলাম জানিয়ে যাবেন।

বিকেল চারটের সময় রাজা আলী বিমা এলেন। মোটা বিশাল নাক, দীর্ঘ মেদবহুল কৃষ্ণকালো দেহধারী বৃদ্ধ রাজা, বাজোচিত বিচিত্র ঝলমলে পোশাকে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে প্রচুর পারিষদ ও বান্দার দল। কাছে আসতে একজন বান্দা ঘোড়াব কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, তাব পিঠে পা দিয়ে রাজা ঘোড়া থেকে নামলেন

হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। নিকষ কালো মুখে সুন্দর শুভ্র পরিপূর্ণ দুপাটি দাঁত যেন ঝলমল করে উঠল। কাছে এসে দেহ নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে দুধ, ডিম ও মুরগী দিয়ে উপঢৌকন পর্ব সারলেন।

সে সময়ে ডাক্তার কস্টেগান তার ৩ ৩ রাইফেলটি খুলে পরিষ্কার করছিল। সেদিকে রাজার কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ল। সাহেবরা তাঁকে এই অস্ত্রটির কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল। রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটটি দেখিয়ে কস্টেগান বললে, এর দ্বারা রাত্রিতেও গুলি করা সম্ভব নির্ভুলভাবে। যদিও রাজা মাথা নেড়ে সব সহাস্যমুখেই শুনে গেলেন তবু যেন তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস।

সাহেবরাও রাজাকে অনেক কিছু উপহার দিল। এক সময় রাজা সদলবলে ফিরে গেলেন তাঁর মাটির দেয়াল ঘেরা রাজ্যে।

কর্পোরাল আলী কুসান এক সময়ে ডাক্তার কস্টেগানকে জিগ্যেস করলে, স্যার, আপনি কি রাজাকে রাইফেলটি ধার দেবেন বলেছেন?

বিস্মিত কস্টেগান বললে, কই, না তো!

রিচার্ড জিগ্যেস করলে, কেন এ কথা বলছো কুসান?

—যখন কস্টেগান সাহেব রসিকতা করে রাত্রিতেও নিখুঁতভাবে গুলি করা যায় বললেন, তখন রাজা আলী বিমা তাঁর নিজ ভাষায় বললে, 'এর প্রমাণ আমি নেব'। ওদের ভাষা আমি কিছু কিছু বুঝি কিনা স্যার।

সেদিন রাত্রে ঘটল ঘটনাটা।

রাত্রির আহারের পর সাহেব তিনজন সিগারেট ধরিয়ে গল্পগুজব করছিলেন। ঠাণ্ডা শীতকালের হাওয়া শুরু হয়েছে। একসময় বিশাল গোলাকৃতি কুয়াশা ঢাকা চাঁদ উঠল আকাশে।

দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়ালের ওপাশে নিরবচ্ছিন্ন ড্রাম বেজে চলেছে। আলোর আভাও দেখা যায়। নেটিভরা হয়ত কোন উৎসব করছে। অপর তিন দিকে রুক্ষ শূন্য প্রান্তর ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

রিচার্ড বলে উঠল, ঐ গ্যাখো আবার হায়নারা এসে উপস্থিত হয়েছে।

কস্টেগান অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ তো দেখছি মহাজ্বালাতন। শহরের কাছেও এ ব্যাটাদের উৎপাত। এবারে ছেড়ে কথা বলব না। ব্যাটাদের কয়েকটাকে আজ খতম করবই।—বলে উঠে গিয়ে ৩০৩ রাইফেলটা বের করে নিয়ে এল।

একটি দুটি করে বাড়তে বাড়তে অনেকগুলি হায়না এসে জড়ো

হয়েছে সেখানে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেশ দলে ভারী হয়ে তার. বিকট চিৎকার শুরু করে দিল।

কস্টেগানের আর সহ্য হল না। রাইফেলটা তুলে সে দ্রুত তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেল। অপর দুজন সাহেবও তার সঙ্গে বাইরে এল। হায়নাগুলি সামান্য পেছিয়ে গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিচার্ড বললে, ডাক্তার দেখ ঐ বড়টাকে মারতে পার কিনা। ওটা যে একটু আলাদা ধরনের মনে হচ্ছে।

দেখা গেল সত্যিই দলের মধ্যে একটা হায়না বেশ বড়, সে সামনের পা দুটোকে দুদিকে প্রসারিত করে যেন লাফ দেবার উদ্যোগ করছে। অন্যগুলির চেয়ে সেটার গায়ের রং যেন কিছু হাল্কা। আবছা আলোয় তার কাঁধের কাছের দাগগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সামনের দিকে হাঁ-করা মুখ নিয়ে সে দাড়িয়ে ছিল। জিভ লক-লক করছে, মুখের চামড়া কুঁচকানো, মুখটা যেন হাসি-হাসি।

দেখে সহসা সাহেবদের মনে একটা অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হল। কার সঙ্গে যেন এর একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য মনে হল।

কস্টেগান রাইফেল নিশানা করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়ল। মুহূর্ত পূর্বে জানোয়ারটা শূন্যে লাফ দিয়েছিল, আহত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। বিকট রোমহর্ষক একটা চিৎকার উত্থিত হল, আর ধুলোয় ভরে গেল বাতাস। বাদ বাকি হায়নার দল মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পলিটিকাল এজেন্ট হোমস্ বললে, আমার কিন্তু ভাই চামড়াটা চাই।

কিন্তু ধুলো থিতিয়ে আসতে দেখা গেল জানোয়ারটা বড় বড় লাফ দিয়ে প্রায় একশ গজ দূরে সরে গেছে। দুবার সে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। দুবারই উঠে ফের ছুট দিল। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতেও একসময় সে দূরে ঝাপসা জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেবরা এগিয়ে গেল যেখানটায় ওকে গুলি করা হয়েছিল সেখানে। চতুর্দিকে রক্তের দাগ, মাটিতে আঁচড়ানো খিমচানোর দাগ। এক জায়গায় পাওয়া গেল সেই ছিন্ন নীচের চোয়ালটা। গুলির আঘাতে হায়নাটার চোয়াল নিঃশেষে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে গেছে।

বেচারা! হোমস্ বলে উঠল, ওটাকে এ রকম ব্যথাতুর অবস্থায় মরতে দেওয়া উচিত হবে না। খুঁজে দেখ বেশী দূর হয়ত যেতে পারে নি। লাইট নিয়ে এস, একটা হ্যারিকেন।

রিচার্ড ছিন্ন চোয়ালটাকে তুলে পকেটে রেখে দিল। অস্বাভাবিক বড় চোয়াল। পরে হয়ত কোন যাদুঘরে দেওয়া যেতে পারে।

লণ্ঠন নিয়ে ওরা রক্তের দাগ অনুসরণ করে করে এক সময় এসে গুডাডুর মাটির দেওয়ালের একটা গেটের সামনে উপস্থিত হল। আশ্চর্য তো! জানোয়ারেরা আহত হলে সর্বদা বনের নির্জন স্থানের দিকে পালায়। কে কবে শুনেছে যে আহত হায়না গিয়ে জনবহুল শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

গেটটার কাছাকাছি এসে আলী কুসান হ্যারিকেন হাতে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীতকণ্ঠে বললে, দেখে শুনে আমার কিন্তু এসব ভাল লাগছে না স্যার!

কন্স্টেগান বললে, ব্যাটা বোধ করি অন্ধ হয়ে গেছে, না হলে শহরে ঢুকবে কেন?

রক্তের দাগ বন্ধ গেট পেরিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একটা হায়না ঢুকেছে, নিশ্চয়ই ভেতরে কোন হৈ-হল্লা চিৎকার শুরু হত। কিন্তু সব নীরব নিস্তব্ধ। রাত্রিবেলা স্থানীয় লোকদের বিরক্ত করা সমীচীন মনে করল না সাহেবরা। বাধ্য হয়ে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল।

মাঝরাত্রে কস্টেগান সবাইকে জাগিয়ে সবিস্ময়ে বললে, জানো, কোথাও আর রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই।

কেউ তেমন বিস্মিত হল না। কেন না অপরাপর হায়নারাই হয়ত তা চেটে মেরে দিয়েছে।

পরদিন পলিটিকাল অফিসার হোমস্ তার সরকারী কাজের জন্য শহরবাসী ও রাজাকে ডেকে পাঠালো, কিছু তদন্তাদি করবার মানসে।

কিন্তু আশ্চর্য, দু-তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পরও কেউ এল না দেখে হোমস্ মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। শাসক ইংরেজের সম্মানে পড়ল প্রচণ্ড ঘা।

—আলী কুসান! এরা এত দেরী করছে কেন?

—স্যার, ওদের ঢোল বাজনা শুনে বড় ভয় হচ্ছে। কোন কিছু অঘটন ঘটেছে মনে হয়—বাজনার শব্দ সে-রকমই।

এরপর একদল লোক এল কিন্তু তাদের সঙ্গে রাজা নেই। ক্রুদ্ধ হোমস্ তাদের বললে, তোমাদের রাজা যদি না আসে তা হলে আমি সৈন্য দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে আনাব।

কোন উত্তর না দিয়ে লোকগুলি ফের ফিরে গেল মাটির দেওয়ালের ওপারে।

এরপরও একঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু আলী বিমা-র কোন পাত্তা নেই। তখন নিজেদের দাপট রাখবার জন্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে সাহেব তিনজন গুডাড়ু শহরে প্রবেশ করল।

সমস্ত শহর নিস্তব্ধ। কেমন যেন ম্রিয়মাণ। পুরুষরা মনমরা, মেয়েরা কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেল, এমন কি উলঙ্গ শিশুগুলিও এদিক ওদিক পালিয়ে গেল ওদের দেখে।

রাজার একচালা প্রাসাদটি শহরের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত। তার কাছে যেতে কান্না শোনা গেল নারীকণ্ঠের—মরা-কান্না। তা হলে কি কারুর মৃত্যু হয়েছে? এরপর শুরু হল সমবেত কান্নাধ্বনি।

গেটে ঢুকতে প্রহরী বাধা দিতে আলী কুসানের ধাক্কা খেয়ে সে ছিটকে সরে গেল। সাহেবরা ভেতরে প্রবেশ করল।

হোমস্ একা অন্দরে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাইরে এসে বললে, আরে এ যে এক কাণ্ড হয়েছে দেখছি। ওরা বলছে রাজা মরে গেছে। আমাকে দেখতে দিচ্ছে না। আলী কুসান, ছ'জন সৈন্য নিয়ে এস তো আমার সঙ্গে। সবাইকে হটিয়ে দাও।

আলী কুসান সৈন্যদের সাহায্যে রাজার আত্মীয়-পরিজন সবাইকে সরিয়ে দিল।

ওরা সবাই ভেতরে ঢুকল। হোমস্ বললে, তদন্ত দরকার। মনে হচ্ছে রাজা খুন হয়েছে।

অত্যন্ত নীচু ছাদের একটা অন্ধকার ঘর। মেঝেতে শুকনো ঘাসের ওপরে রাজার মৃতদেহ শোয়ানো। সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। মুখটারও অধিকাংশ একটা পাগড়ীতে আবৃত। রক্তে ভিজে আছে পাগড়ীর একটা অংশ।

ডাক্তার কস্টেগান পাশে বসে পড়ে কম্পিত হস্তে মুখের পাগড়ীটা সরিয়ে দিল। দেখা গেল মুখের নিম্নাংশে একটা বীভৎস ক্ষত, রক্তে মাখামাখি। দেহটা শক্ত হয়ে গেছে। দুটো হাত গলার কাছে তোলা। পা দুটো মোড়া, মনে হয় মৃত্যুর পূর্বে ধস্তাধস্তি হয়েছে।

হোমস্ ধীরে ধীরে পাগড়ীটা দিয়ে পুনরায় মুখটা ঢেকে দিল। সাহেবরা বিমূঢ়ের মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। একই সঙ্গে প্রত্যেকের মনে একই চিন্তার উদ্ভব হল।

—কি সাংঘাতিক, লোকটার একটা চোয়াল গুলির আঘাতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু চোয়ালটা তো এখানে নেই. কস্টেগান সবিস্ময়ে বলে উঠল।

—বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গুলির আঘাতে, এবারে হোমসের বিস্মিত

হওয়ার পালা, কিন্তু গুডাডুতে তো কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। গুলি আসবে কোত্থেকে ?

এর কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া গেল না। বাইরে স্থানীয় লোকেরা ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সাহেবদের এই অনধিকার প্রবেশে।

বাধ্য হয়ে ওরা সেখান থেকে ফিরে এল।

ফিরে এসে হোমস্ সমস্ত শহরবাসীকে ডাকল এ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য।

কিন্তু কোন আফ্রিকানের কাছ থেকেই কোন কিছু সংবাদ পাওয়া গেল না। তারা রাজার মৃত্যু বা হত্যা সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানে না।

আলী বিমা প্রচুর রক্তক্ষরণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। গুলি লেগেই তাঁর চোয়াল উড়ে গেছে—আর সে চোয়ালও মৃতদেহের ধারে কাছে কোথাও নেই। মুখের পাগড়ীর ভাঁজে দুটি মাত্র দাঁত পাওয়া গেছে। শ্বেত শুভ্র দুটি চকচকে দাঁত।

ঐ দাঁত দুটি রিচার্ড সঙ্গে করে এনে দেখেছে যে তার কাছে রাখা সেই চোয়ালে, হায়নার চোয়ালে যেখানে দুটি দাঁত নেই, সেই গর্তে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত বলে রিচার্ড চুপ করে যায়।

জাহাজের সহযাত্রী বন্ধু রাইট বিহ্বল হয়ে, কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়ে বলে ওঠে, তাহলে কি বলতে চাও, এ চোয়ালটা আলী বিমার-ই।

—হ্যাঁ, তাই।

—তবে কি বলতে চাও ঐ আলী বিমা-ই হায়নায় রূপান্তরীত হয়ে সে রাতে কস্টেগানের গুলি খেয়েছিল ?

—আমি আর কিছু বলতে চাই না, রিচার্ডের কণ্ঠস্বর যেন কিছুটা কম্পিত, কাহিনী সবিস্তারে বললাম। এবার বিশ্বাস করতে হয় করো, নয়ত অবিশ্বাসের হাসি হেসে সবটাই কল্পনা বলে উড়িয়ে দাও।

মানবসিংহ

আজও আফ্রিকার কোন কোন উপজাতির ভেতর এমন সব অদ্ভুত মানুষ জীবিত রয়েছে, যারা ইচ্ছেমত যে কোন জন্তু-জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

অন্তত সেই সেই উপজাতিরা এ-কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে থাকে।

শুনলে মনে হয় গাঁজাখুরি, অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অসভ্য অন্ধকুসংস্কার।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, বিশ্বাস না করেইবা উপায় কি? কারণ, আধুনিক সুসভ্য সংস্কারমুক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ স্বয়ং এ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন।

সেই অভিনব রোমাঞ্চকর কাহিনীটিই আজ আমাদের বক্তব্য।

ক্যাপ্টেন টেলর ছিলেন ইথিওপিয়ান সোমালিল্যাণ্ড সীমান্তের জনৈক সহকারী শাসক এবং প্রসিদ্ধ শিকারী।

জীবনে বহুবিধ শিকারই তিনি করেছেন: হাতি, গণ্ডার সিংহ, হরিণ, হিপো ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদা তিনি দলবল সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্থানীয় কয়েকটি জেলা সফরিতে (ভ্রমণে) বের হলেন।

নিজে ক'জন আসকারি (সৈন্য) নিয়ে আগে আগে চলেছেন। পেছনে, অনেকটা পেছনে আসছে তাঁর খাদ্যদ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আরেকটি বড় দল।

এক সময় পেছনের দল থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে

সাহেবকে সংবাদ দিল যে, একটা বৃদ্ধ সিংহ নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের দলকে নাকি অনুসরণ করে আসছে।

বৃদ্ধ সিংহ!

চমকে উঠলেন মিঃ টেলর। তাঁর মনে জেগে উঠল একটি মাত্র নাম:

'লিবা!'

এই 'লিবা' নামক বৃদ্ধ সিংহটা কিছুকাল যাবত এ অঞ্চলে যত্রতত্র জন্তু-জানোয়ার এবং মানুষ খেয়ে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে সিংহটা এখানে ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার করে তুলেছে।

'শ'দেড়েক মাইল এলাকা নিয়ে এর বিচরণ।

আজ এখানে একটি গরু, কাল তিরিশ মাইল দূরে একটি উট, পরশু আরও ষোল মাইল দূরে একজন মানুষ, এইভাবে ক্রমাগত সে হত্যা করে চলেছে।

যেখানেই হত্যাকাণ্ড সেখানেই পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। হুবহু পায়ের ছাপ। পেছনের বাঁ থাবার বুড়ো-আঙুলহীন ছাপ।

পূর্ববর্তী যে-কোন এক দুর্ঘটনায় 'লিবা' নামক বৃদ্ধ সিংহটি বোধ করি একদা বুড়ো আঙুলটা হারায়।

স্থানীয় মানুষেরা ওর নাম দিয়েছে 'লিবা'।

আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও স্থানীয় উপজাতীয়রা কোনদিনই কোন শিকারী বা এই শাসক সাহেব টেলরের শরণাপন্ন হয় নি সিংহটাকে সংহার করবার জন্যে বা কোন বিহিত করবার জন্যে।

কারণ? কারণ হল এরা ভয় পায় খবর দিতে।

উৎসুক মিঃ টেলর আলাপ-আলোচনা করে দেশীয় মানুষদের কাছ থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করলেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অবিশ্বাস্য।

ঐ বৃদ্ধ সিংহ 'লিবা' নাকি আদপে সিংহই নয়। সে নাকি সিংহরূপী একজন মানুষ, একজন মহাগুণীন মানুষ।

সেই যাদুশক্তিসম্পন্ন মানুষটির নাম "আলি"।

বলছ কি ?

হ্যাঁ ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করুন সাহেব ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। কখনো মানুষ···কখনো সিংহ···কখনো···

এও বিশ্বাস করতে হবে ?

বিশ্বাস করুন হুজুর। আপনি দেখা হলে লক্ষ্য করে দেখবেন 'লিবা'র মতই গুণীন 'আলি'রও বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা নেই। পায়ের ছাপ, থাবার ছাপ একই, দুজনেরই এক··

শুনে সাহেব হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। একি গঞ্জিকা সেবন-প্রসূত কোন কল্পিত কাহিনী···দূর দূর! যতসব কুসংস্কার···অসভ্য বর্বর মানুষের স্রেফ অন্ধ-সংস্কার।

যেতে যেতে সে সন্ধ্যায একটি গ্রামের উপকণ্ঠে মিঃ টেলরের তাঁবু পড়ল।

অদূরে দেখা গেল আরেকটি দল তাঁবু স্থাপন করেছে। একজন আউলি হান্ উপজাতীয় সওদাগর নতুন কোন চারণক্ষেত্রে যাওয়ার পথে বহু গবাদি পশু নিয়ে জাবেরা বানিয়ে (বেড়া দেওয়া সাময়িক খোঁযাড বিশেষ) রাত্রিবাস করবার উদ্যোগ করছে। রাত্রি কালে এতগুলো গবাদি পশু নিয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। এ অঞ্চলে গিজগিজ করছে সিংহ। তাই ওরা তাঁবু গেড়েছে।

গভীর রাত্রিতে অসংখ্য গরু-মোষের আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল মিঃ টেলরের।

বাইরে এসে দেখলেন খোঁয়াড় ভেঙে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেগুলো পালাচ্ছে। যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগার অবস্থা।

এতটা ত্রাসের একটি মাত্রই কারণ হতে পারে, তা হল সিংহের অতর্কিত আক্রমণ।

অন্ধকারে শূন্যে রাইফেল চালালেন সাহেব।

অতঃপর টর্চ জেলে আশেপাশে দেখলেন সেই অবধারিত পায়ের ছাপ। সেই বৃদ্ধ সিংহ 'লিবা'র বুড়ো আঙুলহীন থাবার ছাপ।

সে-রাতে কারুরই আর ঘুম হল না। ঘুমের প্রশ্ন অবান্তর। সবাই সতর্ক ও সজাগ হ'য়ে রইল।

এমন সময় ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

কোথেকে সেখানে এসে উপস্থিত হল পূর্বোল্লিখিত ও প্রখ্যাত গুণীন 'আলি'।

শুভ্রকেশ, বৃদ্ধ, কুঞ্চিত বলীরেখাকীর্ণ কুৎসিত-দর্শন নিকষ কালো একটি মানুষ।

লোকটির বাড়ি এ অঞ্চল থেকে মাইল-কুড়ি দূরে, অথচ অত রাত্রে এখানে আচমকা সে এলই বা কি করে ভেবে মিঃ টেলর বিস্মিত হলেন।

লোকটি এসে চিরাচরিত প্রথায় আভূমি অভিবাদন করে দাঁড়ালো, মুখে বিচিত্র হাসি।

পরিচয় হতে দেখা গেল লোকটির কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার বেশ ভালো, ভদ্র এবং বিনীত।

এ-কথা সে কথার পর সে বললে, হুজুর একটা কথা বলি।

বলো—

আপনি 'লিবা'কে কখনো মারবার চেষ্টা করবেন না।

কেন?

এটা আমার একটা আর্জি হুজুর।

সে কথার জবাব না দিয়ে মিঃ টেলর বললেন, আমি তোমায় একটা প্রশ্ন করি 'আলি'।

করুন হুজুর।

আচ্ছা 'আলি'···লোকে যে বলে তুমি নাকি···

মাঝপথে বাধা দিয়ে 'আলি' বলে ওঠে, আপনি ঠিকই শুনেছেন হুজুর, বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তারপর নিজের বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙ্গুলহীন পাতার দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইল।

সেদিকে তাকিয়ে সাহেবের কেন যেন মনে হল ওর পা-টা মানুষের নয়। ওটা যেন ক্রমে ক্রমে সিংহের থাবায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এ ভাব বেশীক্ষণ রইল না। এ ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম মুহূর্ত খানেক রইল।

পরক্ষণেই সাহেবের সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা 'আলি', তুমি 'সিবা'কে মারতে বারণ করছ কেন ?

বারণ করছি ? সে কথা নাই বা জানলেন হুজুর। মৃদু মৃদু হাসতে লাগল আলি, অবশ্য এর পরিবর্তে আমি আপনাকেও একটা কথা দেব, মানে কথা দিচ্ছি হুজুর। এ জীবনে কোন সিংহ আপনার ক্ষতি করবে না। আমি ওদের বলে দেব।

'বলে দেবে ? শুনে সাহেব হাঁ হয়ে গেলেন। বলে কি লোকটা ?

' না—মানুষটার চাউনীর মধ্যে কোন কৌতুক বা পরিহাসের লেশ মাত্র নেই।

তবু সাহেব খেলাচ্ছলেই বললেন, বেশ। তবে শুধু আমার নয়, আমার দলের সমস্ত লোক-লস্কর, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতিদের ব্যাপারেও কথা দিতে হবে। তাদেরও যেন সিংহেরা কোন ক্ষয়-ক্ষতি না করে।

বলীরেখাকীর্ণ মুখে হলদে দাঁত বের করে বিচিত্রভাবে হাসল 'আলি'। বললে, এ আপনি বড্ডো বেশী সুবিধে চাইছেন হুজুর।

আপনিই বলুন, 'আমার' সিংহেরা তাহলে খাবে কি। এ অঞ্চলে যত সিংহ আছে, তত খাদ্য নেই।

মিঃ টেলর মাথা নেড়ে তেমনি পরিহাসচ্ছলেই বললেন, উঁহু কোন কথা শুনতে চাই না, এ গ্যারান্টিও তোমাকে দিতেই হবে। এর পরিবর্তে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি শুধু 'লিবা' কেন, কোন সিংহকেই মারব না আমি।

বহুক্ষণ কি যেন ভাবল বৃদ্ধ 'আলি'। বিড় বিড় করে নিজ মনেই কি সব কথা বলে গেল।

অবশেষে মুখ তুলে সাহেবের পানে স্পষ্ট তাকিয়ে বললে, বেশ। তাই হবে হুজুর। তবে মেহেরবানী করে, এ চুক্তির কথা মনে রাখবেন। ভুলবেন না যেন। আমি এখন আসি সাহেব।

বলে ধীর পদে অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রায় মিলিয়ে গেল।

স্থানীয় অপর এক অফিসারের কাছে ইতিপূর্বেই মিঃ টেলর শুনেছিলেন যে, এই 'আলি' হাতে শুধুমাত্র একটা ছড়ি নিয়েই হিপো-গণ্ডার-হাতি-সিংহ প্রভৃতি হাজারো প্রকার হিংস্র-প্রাণী-অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে রাত-বিরেতে একা একাই যাতায়াত করে থাকে। যা অন্য কোন আফ্রিকানের পক্ষেও প্রকৃতই কল্পনাতীত।

তাছাড়া লোকটা নাকি পায়ে হেঁটেই অবিশ্বাস্য রকমের দূরত্বে যাতায়াত করতে সক্ষম।

সাহেব প্রথমটা এ-সব কথা পরিহাস ও কৌতুক ভেবেই নিয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি এর প্রতিটি প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

সত্যি-সত্যিই আর কোনদিন কোন সিংহ তাদের কাছাকাছি এলেও কক্ষনো কোন ক্ষতি করেনি, আক্রমণ তো দূরস্থান।

'আলি'র প্রতিশ্রুতির প্রথম প্রমাণ পেলেন কয়েক মাস বাদেই।

পথ চলতে এক রাতে স্থাপিত তাঁবুর মধ্যে প্রচণ্ড গোলমালে মিঃ টেলর জেগে উঠলেন।

সঙ্গের ঘোড়া ও খচ্চরের দলের আচমকা আর্তনাদই নিদ্রা ভঙ্গের কারণ।

রাইফেল হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। জানোয়ারগুলির আর্তনাদ ক্রমশঃ থেমে আসছে।

শক্তিশালী টর্চের আলোয় প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁর তাঁবুর চত্বরে অসংখ্য সিংহের পায়ের ছাপ। সেই বৃদ্ধ 'লিবা'র পায়ের ছাপও সেখানে রয়েছে।

সিংহগুলি মনে হল সাহেবের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে। ঘোড়া এবং খচ্চরদের আস্তাবলের আশেপাশেও ঘুরেছে।

কিন্তু আশ্চর্য কোন প্রাণীর গায়ে এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগায় নি।

এটা তো সিংহদের স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যবহার! এতটা অহিংসভাব তো ওদের কুষ্ঠিতে লেখে না!

তা হলে?

তাহলে কি 'আলি'র সেই বাচনিক 'চুক্তি'র কথাই সত্যি?

'আলি'ই কি তাহলে রূপান্তরিত 'লিবা'? বিহ্বল মিঃ টেলর কেমন যেন কম্পিত হস্তে তাঁর পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন।

এতো দেখছি অলৌকিক-কাণ্ড কারখানা!

এ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে···কিন্তু···নাঃ···অলৌকিক হলেও বিশ্বাস না করেও যে উপায় নেই। এযে প্রত্যক্ষ সত্যি।

সে-রাত্রেই খবর এল, পাশের গ্রামে সিংহের আক্রমণে একজন মানুষ নিহত হয়েছে।

পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল সেখানে আক্রমণকারী সিংহ 'লিবা' ছাড়া আর কেউ নয়।

তাজ্জব হয়ে সাহেব তাঁবুতে বসে পাইপ টানতে লাগলেন।

ঘণ্টা কয়েক বাদে স্বয়ং 'আলি' এসে উপস্থিত সাহেবের তাঁবুতে। সেই নিশুতি রাত্রে একা।

হলদে দাঁত বের করে বিচিত্র হেসে বললে, বহাল তবিয়তে আছেন তো হুজুর? আশা করি আমাদের পরস্পরের চুক্তি পালিত হচ্ছে।

সাহেব হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না। তাঁর যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

দৃষ্টি নামিয়ে 'আলির' বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটার শূন্য স্থানের পানে তাকালেন আর অমনি তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে ঝিরি ঝিরি করা একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল।

সাহেবের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে উঠল 'আলি', সব কিছু খুব আজব লাগছে হুজুর, তাই না?

মিঃ টেলর আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন।

আমাদের এখানে আরও বহু গুণীন আছে হুজুর, আলি বলে চলে, যারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। আপনাকে এক বুড়ির কাছে নিয়ে যাব। দেখবেন তার ক্ষমতার বহর।

ক'দিন বাদে 'আলি' সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিল আরেক বিস্ময়কর মেয়ে গুণীনের কাছে।

ডাইনী বুড়ি। বয়সের গাছ-পাথর নেই। নাক কান ফুটো, তাতে অজস্র জরিবুটি। তার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা হল, সে নাকি অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত কুমীর কুলকে পরিচালনা করতে পারে।

যাবতীয় কুমীরেরা তার কথা শোনে। ডাক দিলে কালবিলম্ব না করে তারা ডাঙায় উঠে আসে।

মিঃ টেলর সব দেখেশুনে তো জ্ঞান হারাবার দাখিল হলেন।

আজকের যুগে এও নাকি সম্ভব!

সাহেবের দলবলের অনেকে ভ্রমণ-কালীন, স্নানের সময়, নদী সাঁতরাবার মুখে এইসব নরখাদক কুমীরের পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

সাহেব 'আলি'র মত এই ডাইনী বুড়ির সঙ্গেও 'চুক্তি' করবার প্রস্তাব করলেন।

বুড়ি একবাক্যে রাজী। তবে তার পাল্টা কোন শর্ত নেই, কিন্তু হুজুর সাহেবের কাছে এর পরিবর্তে সে কিছু অর্থ প্রার্থনা করে। বকশিস হিসেবেই।

মিঃ টেলর মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করলেন বুড়িকে।

বুড়ি ডাইনী কি সব মন্ত্র পাঠ করল আকাশপানে তাকিয়ে, তারপর সাহেবকে অভয় দিলে, হুজুর আপনার দলের কোন মানুষকে কুমীরেরা আর কক্ষনো কোন অনিষ্ট করবে না।

চুক্তি হয়ে গেল।

এবং সত্যি সত্যিই, এরপর যতবার মিঃ টেলর আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে ছিলেন, না সিংহ, না কুমীর, কেউই তাঁকে বা তাঁর কোন দলীয় লোককে কখনো আক্রমণ করেনি, বা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি।

ধন্য আলি, ধন্য ডাইনী বুড়ি, দুজনেই অবিশ্বাস্য অলৌকিক শক্তির অধিকারী মানুষ!
